# Unlucky 23

– মোহাম্মদ রিয়াজ হাসান জুয়েল

শুনেছি ভালোবাসা নাকি সবার জীবনে একবার হলেও আসে। আমার জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ভালোবেসে ছিলাম একটি মেয়েকে। আমার জীবনে চলার পথের একটা অংশও হয়ে গিয়েছিল সে।

স্কুলে পড়ার সময় কয়েকটা মঞ্চ নাটক করেছিলাম। তাই অভিনয় সম্পর্কে ছোটখাটো জ্ঞান ছিল আমার। কিন্তু আমার নন্দিনীর অভিনয়টা ধরতে পারিনি। এতোই অন্ধ ছিলাম ওর ভালোবাসায়, তাই ওর অভিনয়টা বুঝতেই পারিনি। নন্দিনী আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল। আমার এক আন্টির বিয়েতে নন্দিনীকে প্রথম দেখতে পাই। পরনে ছিল শাদা রঙের সেলোয়ার কামিজ। আর চুলগুলো ছিল খোলা।

সেদিনকার সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। ওকে আমার প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায়। আমার এই ভালো লাগা, ভালোবাসাকে দীর্ঘ এক বছর মনের ভেতর লালন করার পর মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে ওর দেখা পাই।

সবাই যখন মজা করার জন্য একে অপরকে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছিল, তখন আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল ওর গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিতে। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ করেই পেছন দিক দিয়ে হলুদ মাখা দুটি হাত আমার মুখে এসে পড়লো। তাকিয়ে দেখি নন্দিনী।

ওই যখন ভালোবাসার জানালাটা খুললো তখন আমার ভালোবাসার দরজাটা খুলতে দোষ কোথায়? আমিও ওর গালে হলুদ মাখিয়ে দিলাম।

প্রথমবারের মতো দুজন দুজনের ছোয়া পেলাম। তাও আবার গালে। সে রাতে আমি ঘুমাতে পারিনি। পরদিন বিয়ে, সবাই বরযাত্রায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। নন্দিনীকে দেখলাম শাড়ি পরেছে। এই প্রথম ওকে শাড়ি পরা দেখলাম। লজ্জাহীন, পলকহীনভাবে তাকিয়ে ছিলাম।

ওর চোখে–মুখে ছিল লজ্জা, এ জন্য ঠিকমতো তাকাতেও পারছিল না।

হাতে ছিল ক্যামেরা। পটাপট দুই তিনটা ছবি তুলে ফেললাম। বাসর ঘর সাজানোর দায়িত্ব ছিল আমাদের কয়েকজনের ওপর। তার মধ্যে নন্দিনীও ছিল। ও খুব সুন্দর করে হাতে মেহেদী লাগাতে পারতো।

বাসর ঘর সাজাতে সাজাতে বললাম, আমার হাতে মেহেদী দিয়ে দিতে হবে।

তারপর রাত বারোটার দিকে মেহেদী নিতে বসলাম। ওর কোলে বালিশ। তার ওপর আমার হাত।

উপুড় হয়ে আমার হাতে মেহেদী দিয়ে নকশা করতে লাগলো। আর আমি ওর চুলের ঘ্রাণ নিতে লাগলাম। সে যে কি ঘ্রাণ! জগতের সব ফুল এ ঘ্রাণের কাছে হার মানবে।

বৌভাতের দিন নন্দিনী সবার সঙ্গে, আগেই কমিউনিটি সেন্টারে চলে যায়।

আমার একটা কাজের জন্য যেতে একটু দেরি হয়। গিয়ে দেখি সে খেতে বসে গেছে। সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কখন এসেছো?

এই কিছুক্ষণ আগে। বলেই আমাকে খাইয়ে দিল।

এই প্রথম আমার ঠোঁট ওর আঙুলের স্পর্শ পায়। তারপর আমিও ওকে খাইয়ে দিলাম। জামাই–বৌ যে জায়গায় বসে, সে জায়গায় বসে ছবি তুললাম।

এক মামি বললো, তোমাদের দুজনকে খুব সুন্দর মানিয়েছে।

ও হাসতে থাকে।

এসব সুন্দর সুন্দর কিছু ঘটনা সেদিন আমার ভালোবাসার ঘোড়াটাকে আরো দ্রুত বেগে ধাবিত করে।

তারপর প্রায় দুমাস অন্তর অন্তর নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হতো বা দেখা করতাম।

নন্দিনী বুঝতো আমি ওর কাছে কি চাই।

কিন্তু আমি ওকে কখনোই বলিনি। তাই ভাবলাম, ওকে সব খুলে বলা উচিত। একদিন সব খুলে বললামও।

ও বললো, আপনাকে আমার ভালোলাগে। কিন্তু আমার বাবা–মা যেখানে চাইবে, আমি সেখানে বিয়ে করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আপনিও যদি হন তাহলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

ওর কথাগুলো শুনে মনে হলো, সেদিনের সে হাসিটায় ভালোবাসা মাখা ছিল না। ছিল হেয়ালিতে মাখা। সেদিনের বিয়ে বাড়ির ঘটনাগুলোর সঙ্গে ওর এ কথার কোন মিল পেলাম না। কথায় আছে, *স্বয়ং বিধাতাই নাকি নারীর মন বোঝে না।* আমি অধম বুঝবো কি করে!

আসলে আমার আবেগটা ছিল বেশি। সিদ্ধান্ত নিলাম, আগে নিজেকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো, তারপর ওর বাবা–মায়ের কাছে যাবো। অনেকটা সিনেমা নাটকের মতো। এখন ভাবলে হাসিই পায়।

যাই হোক। এরপর প্রায় পাচ মাস ওর সঙ্গে আমার দেখা বা যোগাযোগ কিছুই হয়নি। কথায় আছে Out of sight, out of mind অর্থাৎ চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল হয়। আমার জীবনে এই কথাটা মর্মে মর্মে ফলে গেল।

এরপর এলো সেই প্রতীক্ষিত টোয়েনটি থৃ অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর। নন্দিনীর জন্মদিন।

সেদিন সকাল থেকেই ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো আমার মন। ঠিক করলাম বিকেলে ফোন করবো।

কিন্তু তার আগে বাবা এসে বললো, তোর ভাইয়া ফোন করেছে, মুক্ত বাংলা মার্কেটের Apex-এর সামনে থাকতে বলেছে, খুব জরুরি। আমি সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম গিয়ে যা দেখলাম তা কখনো চিন্তাও করিনি।

ভাইয়া বললো, এটা তোর ভাবী।

আমার মাথায় সত্যি সত্যি যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

যাই হোক। বিয়ে যখন ভাইয়া করেই ফেলেছেন তখন মেনে তো নিতেই হবে। তাই বাবা–মাকে ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়ে বাসার দিকে রওনা হলাম। রিকশায় বসে ভাবতে লাগলাম কিভাবে কথাটা বলবো? বাবাকে বলাটা যতো সহজ হবে, মাকে বলাটা তারচেয়েও কঠিন। কারণ, মায়ের হার্টের সমস্যা আছে।

বাবা মাকে বললাম, মন শক্ত করো। আমি একটা কথা বলবো। ভাইয়া বিয়ে করেছেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো, বাবা ছিলেন নির্বাক। তাদের দুজনের মুখের প্রতিটি রেখায় ছিল কষ্টের ছাপ।

এভাবেই সেই রাতের যাত্রা শুরু। আনুমানিক রাত তিনটার দিকে মোটামুটিভাবে দুপক্ষই মেনে নিল।

সেই রাতের কষ্টটা আমি কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি। এমন কি আমার প্রিয় দুই বন্ধুর সাথেও না।

সেই রাতে এতো ঝামেলার মধ্যেও ওকে জন্ম দিনের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করলাম রাত নয়টার সময়। ওকে পেলাম না। পেলাম ওর বড় আপুকে। তাকে বললাম, ওকে আমার পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবেন।

সেই রাতেই নিজেই নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, আমার আবেগটাকে সামলাতে লাগলাম। আমার পক্ষে বাবা মাকে আরেকটা কষ্ট দেয়া অসম্ভব। জানি সেটা পারবো না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, নন্দিনীর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করে শেষবারের মতো কিছু কথা বলে ওকে আমি মুক্তি দেবো আমার ভালোবাসা থেকে।

ওর জন্মদিন উপলক্ষে পরে রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* বইটা *কুরিয়ার সার্ভিস*–এ পাঠালাম। তার ভেতর ছোট্ট একটা চিঠি দিলাম তাতে লেখা ছিল বইটা পাওয়ার পর যেন ফোন করে। এ কথা লেখার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে ওর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা এবং কথা বলার একটা সুযোগ হয়। কিন্তু তা আর হলো না।

ফোনেই কথা বলার এক পর্যায়ে ওর একটা কথা রিসিভার দিয়ে যখন আমার কানে ঢুকলো তখন মনে হলো সারা শরীরে যেন জ্বালা ধরে গেল। আমার মনের কথাগুলো মনেই রয়ে গেল। শুধু এতোটুকুই বললাম, আমি তোমাকে খুব বিরক্ত করি, তাই না? আর কখনো বিরক্ত করবো না। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। ভালো থেকো। বলে ফোনটা রেখে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালোবাসাকে জ্যান্ত কবর দিলাম। আমিও মুক্তি পেলাম।

এখন থেকে আমার ভুবনে আমি একা। শুধুই একা। আর আছে আমার স্বপ্নগুলো। তা নিয়েই বেচে থাকতে চাই। তারপর থেকেই টোয়েনটি থৃ সংখ্যাটাকে আমার জীবনে *অপয়া সংখ্যা* বানিয়ে ফেললাম। ঘৃণা করতে থাকলাম। ভুলে যেতে থাকলাম।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে টোয়েনটি থৃ সংখ্যাটা বার বার আমার সামনে হাজির হয়। আর স্মরণ করিয়ে দেয় অভিশপ্ত কিছু স্মৃতি।

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*

# অনলাইনে

– তমা

বাইশ বছরের এ জীবনে দুই মাস আগেও জানতাম আমার জীবনে লাভটাভ কিছু হবে না। সত্যি বলতে কি, এসবের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল জিরো। ফ্রেন্ডদের সঙ্গে আমার সব সময়ই এই নিয়ে ঝগড়া হতো। কিন্তু আমার সঙ্গে তারা পারতো না।

কাউকে যে কখনো ভালো লাগেনি তা বলবো না। কিন্তু নিজেকে চেক দিয়েছি শক্তভাবে। আল্লাহর প্রতি আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস। আমি জানি সে কখনোই আমাকে এসব করতে দেবে না। ফ্যামিলি, নিজে, সব কিছু মিলে কেমন যেন রোবট হয়ে গিয়েছিলাম।

শিমুল সব চেঞ্জ করে দিল!

আমি অবসর কাটাই ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে। হ্যা, আমার অনেক নেট ফ্রেন্ড। শিমুলও তাদের মতো একজন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় আট নয় মাস আগে। বিডি চ্যাট–এ। তার আইডি আমার মেসেঞ্জার–এ অ্যাড করা ছিল। দেখা হলে হাই হ্যালো হতো, বেশি কিছু না। তার সঙ্গে কখনোই ফৃ ছিলাম না। তবে তার একটা ব্যাপার ভালো লাগতো যে, সে সব সময়ই পড়াশোনার ব্যাপারে হেলপ করতে চেষ্টা করতো।

মাঝখানে ছয় সাত মাস কোনো খবর নেই। আমি জানতাম সে অস্ট্রেলিয়াতে পড়াশোনা করছে। এই তো এ রোজার সময়ও সে বাংলাদেশে এসে গেল একটা মেইলও করেনি। আমিও যোগাযোগ করিনি।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় সে যখন অস্ট্রেলিয়াতে তখন তার সঙ্গে অনলাইনে দেখা হলো। তখন মোটামুটি রেগুলার আমাদের কথা হতো। ওই মাসের ২২ তারিখ তার বার্থডে ছিল। জানি, অস্ট্রেলিয়ান টাইম আমাদের থেকে পাচ ঘণ্টা এগিয়ে। চিন্তা করলাম সে বিদেশে একা একা থাকে। যদি রাত বারোটায় তাকে বার্থডে উইশ করি তাহলে তার ভালো লাগবে।

২১ তারিখ সন্ধ্যায় দেখি সে অনলাইনে। আমি ঠিক সাতটায় তাকে উইশ করলাম। সে এতো অবাক হলো। খুব খুশি হলো। তার অবস্থা দেখে মনটাই ভালো হয়ে গেল।

এরপর প্রায় প্রতিদিন আমাদের মেসেঞ্জারে কথা হতো। ঈদের দিন কোথাও বের হলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল কখন সন্ধ্যা হবে আর তার সঙ্গে কথা বলবো।

বুঝতে পারছিলাম যে সামথিং ইজ হ্যাপেনিং ইনসাইড মি।

আমি কি শিমুল-এর প্রতি উইক হয়ে যাচ্ছি?

এসব ফিলিংসগুলো আমার জন্য নতুন। কিন্তু এতো সুইট।

তাকে কিছু বলতে ভয় লাগতো যদি সে না করে দেয়?

তখনো আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। ডিসেম্বরের ৬ তারিখ আমরা দুজনই খোলাখুলি আলাপ করলাম এবং এগৃ করলাম।

হ্যা, হয়ে গেছে। আল্লাহর এই দুনিয়ায় কতো কিচুই সম্ভব। কেউ কাউকে দেখলাম না, কেউ কারো গলার স্বরও শুনলাম না। অথচ একজন আরেকজনের প্রতি কি প্রচণ্ড বিশ্বাস। আমাদের অনার্স কমপ্লিট হতে আরো দুই বছর বাকি। তার বাংলাদেশ আসতে আরো আট নয় মাস বাকি। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।

আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে। আমার ফ্যামিলি, তার ফ্যামিলি, সব ম্যানেজ করতে হবে। তবে আমরা ঠিক করেছি গার্ডিয়ানরা না মানলে আমরা নিজেরা কখনোই কিছু করবো না। ২০০৪ সাল আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা হবার এ বছরই হবে। আল্লাহ পাশে থাকুক।

*ঢাকা থেকে*
angle_soul_t@hotmail.com

## স্পর্শকাতর

- ওয়াহিদ উদ্দিন বাদল

তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। থাকি সলিমুল্লাহ হলে। কোরবানির ঈদ শেষে ঢাকা যাবো। ঝুমুরও আমার সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত যাবে। ঝুমুর আমার মামাতো বোন। সে তখন টাঙ্গাইল-এর একটা কলেজে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়তো। হস্টেলে থাকতো। আমাদের বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে।

ভালোবাসা বলতে কি বোঝায় তা যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই ঝুমুরের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব করতাম। কিন্তু তা জানাতে পারতাম না। অবশেষে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পর একদিন তাকে আমার ভালোবাসার কথাটা জানালাম। সে রাজি হলো।

এরপর থেকে নিয়মিত আমাদের মধ্যে চিঠিপত্র বিনিময় হতে লাগলো এবং বাড়ি গেলে সুযোগ পেলেই আমরা প্রাণ খুলে কথা বলতাম। আমাদের বাড়ি উত্তরবঙ্গে। তখনো যমুনা সেতু তৈরি হয়নি। ঝুমুর সাধারণত ভুয়াপুর হয়ে টাঙ্গাইল যেতো। কিন্তু সিদ্ধান্ত হলো ঝুমুর এবার আমার সঙ্গে ঢাকা পর্যন্ত যাবে এবং ঢাকা থেকে তাকে টাঙ্গাইলের গাড়িতে তুলে দেবো।

কথা মতো কাজ। আগে থেকেই গাড়ির টিকেট করা ছিল। যথাসময়ে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম। ঝুমুর বসলো জানালার ধারে। আর আমি তার ডান পাশে। সেই প্রথম ঝুমুরের সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাওয়া হচ্ছে।

ঝুমুরের পাশে বসে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান পুরুষ মনে হচ্ছিল। ঝুমুর সুন্দরী। তার পাশে বসে কেমন যেন এক অজানা শিহরণ খেলে যাচ্ছিল শরীরের মধ্যে। আমাদের গাড়ি যখন মানিকগঞ্জ অতিক্রম করেছে তখন আমার বাম হাতের কনুইয়ের উপরে এক ধরনের স্পর্শ অনুভব করলাম। আমি তেমন পাত্তা দিলাম না। ভাবলাম ঝুমুর হয়তো নড়াচড়া করছে। তাই এ রকম হচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সেই স্পর্শ। মনে হলো

ঝুমুর হয়তো আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে। আমার কনুইয়ের দিকে তাকালাম। দেখলাম ঝুমুরের বাম হাতের আঙুলগুলো আমার বাম হাতের কনুইয়ের ঠিক ওপরে। তার দিকে তাকালাম। কিন্তু সে কিছুই বললো না। মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকালাম।

গাড়িতে বেশ ভিড়। আমার বাম হাতের কনুইয়ের ওপরে আবারও ঝুমুরের বাম হাতের আঙুলের স্পর্শ পেলাম। মনে হলো আলতো করে আঙুল দিয়ে খামচে দিচ্ছে। নিজের অজান্তেই আমার ডান হাতটা নিচের দিকে মেলে দেয়া বাম হাতের কনুইয়ের নিচে চলে যেতেই ঝুমুরের হাতের স্পর্শ পেলাম। ঝুমুর আমার হাতের আঙুলগুলো সজোরে চেপে ধরলো। তারপর তার আঙুলের চাপ আলগা করে দিল। এরপর তার হাতের আঙুলগুলো চেপে ধরলাম। তারপর ছেড়ে দিতেই আমার বুড়ো আঙুলের সঙ্গে তার বুড়ো আঙুল ঘষতে লাগলো।

শরীরের মধ্যে উত্তেজনা অনুভব করলাম। পর্যায়ক্রমে এভাবে কিছুক্ষণ চললো। এক পর্যায়ে ঝুমুরের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তার ফর্শা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। শরীরটা কেমন যেন নুইয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থতা বোধ করছে সে। তার এ রকম অবস্থা এর আগে কোনোদিনও দেখিনি। ভয় পেয়ে গেলাম।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে।

সে কিছুই বললো না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম মাথা ধরেছে কি না।

কিন্তু এবারও কিছুই বললো না।

বললাম, ঠিক আছে, মাথা ধরে থাকলে গাড়ি থেকে নেমে ওষুধ কিনে দেবো।

কিন্তু ওষুধের আর প্রয়োজন হয়নি। গাবতলী পৌঁছে গাড়ি থেকে নামার সময় তাকে আগের মতোই সুস্থ মনে হচ্ছিল। অযথা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এ ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে।

আমার সমবয়সী হওয়ায় বাস্তবতার কারণে আমাদের বিয়ে হয়নি। ঝুমুর এখন অন্যের স্ত্রী এবং এক সন্তানের মা।

কদাচিৎ আমাদের দেখা হয়। মাঝে মধ্যেই ওই ঘটনার কথা মনে পড়ে, বিশেষ করে আমার ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা ভাবলেই আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেরই হাসি পায়।

*খুলনা থেকে*

## সাক্ষী

– ফাতেমা তুজ জোহরা কুমু

এই রিকশা, থামো।

চমকে ফিরলাম। তাকিয়ে দেখি রাজুভাই। চুলগুলো এলোমেলো।

এই, কই যাস? ঝাঝের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

আজ কেন জানি আমার মনটা ভালো নেই। তাই ছোটবেলা থেকে গড়ে ওঠা নিয়ম ভেঙে বেশ ঠাণ্ডা মেজাজে উত্তর দিলাম, স্যারের বাসায় পড়া ছিল, এখন বাসায় ফিরছি।

বেশ একটু খোচা দিয়ে আবার বললেন, যা, যা তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যা। হাস-মুরগি ঘরে তোলার সময় হলো যে, তোদের সান্ধ্য আইন ভেঙে যাবে নইলে।

আজ একটুও লাগতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তাই ওর খোচা এড়িয়ে বললাম, তুমি যে এখানে! বাসায় ফিরবে না। শীত পড়েছে বেশ, বেশি রাত করলে ঠাণ্ডা লাগবে।

তোর দাদিমার্কা কথা থামাবি! এই সোয়েটারটা নিয়ে যা। আমি আগামীকাল গিয়ে নিয়ে আসবো। গরম লাগছে আর বাসায় ফিরতেও দেরি হবে।

আমি কিছু না বলে সোয়েটারটা নিলাম। রিকশা চলতে শুরু করলো।

রাজুভাই, তুমি কি কোনোদিন আমার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করতে পারো না, তোমার কি একবারও মনে হয়নি আমার মন খারাপ কেন? মনে মনে প্রশ্ন করলাম তাকে।

বাসায় ফিরে রুমের দরজা লাগিয়ে ঘর অন্ধকার করে সোয়েটারটায় মুখ ঢাকলাম। এতো বন্যা ছিল দুনয়নে...! যাক, তোমার কোনো কিছুতে আমার স্পর্শ রেখে দিলাম। তুমি কোনোদিন জানবেও না, তোমাকে কেউ একজন নীরবে-নিভৃতে এতো বেশি ভালোবাসে যে কি না তোমাকে একদিন না দেখলে কিংবা কথা না বললে ঘুমাতেও পারে না।

বেশ কয়েকদিন আর দেখা নেই উড়নচণ্ডির। তিন দিন পর খালামণির সঙ্গে ফোনে কথা হয়। সবার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু তোমার কথা জানা হয় না।

পরের দিন তুমি এলে আমাদের বাসায়, আমি তখন পড়ার টেবিলে মনোযোগী ছাত্রীর মতো বলবিদ্যার অংকগুলো রিভিশন দিচ্ছি। সামনে এইচএসসি পরীক্ষা।

তুমি এসেই মাকে জিজ্ঞাসা করলে, শুভ কই খালামণি?

মা বললেন, রুমেই আছে।

ভাইয়ার রুমে যাবার সময় তুমি থমকে দাড়ালে আমার রুমের সামনে। আর আমার সব কিছু যেন থমকে গেল। চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলাম, কালের স্রোত যেন থমকে দাড়ায় আমারও দ্বারপ্রান্তে।

কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। পর মুহূর্তে তুমি গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে চলে গেলে ভাইয়ার রুমে। আমার ইচ্ছের পাখিটা ডানা মেলে চলে যেতে চাইলো পাশের রুমে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে।

জানি, আমি গেলেই এখন তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে বলে উঠবে, এই পণ্ডিত, কেমন আছিস? মুখটা এমন প্যাচার মতো করে রেখেছিস কেন, অবশ্য তোমার-ই বা দোষ কি মুখটা যদি প্যাচার মতোই হয়।

তারচেয়ে এই ভালো চুপচাপ বসে বলবিদ্যার মাঝে ডুবে থাকা কিংবা তোমাকে এড়িয়ে চলা।

কয়েক মিনিট পরই তুমি আমার রুমে ঢুকে প্রথমেই দুই বেনীর একটা টান মেরে বললে, এই যে পণ্ডিত, পড়ছিস নাকি ঘুমাচ্ছিস। তুই আবার ঘোড়া হলি কবে থেকে।

আমিও রেগে বললাম, তুমিই বা এই সাতসকালে ষাড়ের মতো চিৎকার করে বেসুরো গান শুরু করলে কবে থেকে? আবারও বলে রাখছি, আমার চুল ধরে টানবে না।

কেন? একশবার টানবো? তুই সুরের বুঝিস কি। আর মুখটা এমন প্যাচার মতো করে রাখবি না এবং তোরই বা...।

উত্তরে কিছু না বলে আবার অংক শুরু করলাম।

তুমিও আবার গুনগুন করতে করতে আমার রুম থেকে বের হয়ে গেলে।

কিন্তু আমার রুমে সকালটা যেন থমকে গেল। দরজা লাগিয়ে সোয়েটারে অশ্রু বিন্দু জমা করলাম। কেন এমন হয়?

মাথাটা যেন জ্যাম লেগেছে।

তাই বিকেলে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ছাদে গেলাম। দূর থেকে তোমাকে দেখলাম, ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করতে করতে কোথায় যেন যাচ্ছি। অমনি আমার মনটা ভালো হয়ে গেল!

আর মাত্র দুদিন বাকি পরীক্ষা শুরু হতে। তোমাকে দেখি না প্রায় দুদিন হয়ে গেল। আমার চেহারা উসকো-খুসকো হয়ে গেছে পরীক্ষার টেনশনে। জানি, পরীক্ষা আমার ভালো হবে। তবু ভয় জাগে... ভালো করবো

তো! ভালো না করলে তোমার এবং ভাইয়ার সামনে দাড়াতে পারবো না। তোমরা এতো ভালো রেজাল্ট করে আমার জন্য চরম বিপদ করে রেখেছো।

দুপুরে ঘুমাবার জন্য শুয়েছি। কিন্তু ঘুম সে তো আর আসে না। আমার বাম হাতটা দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছি।

এমন সময় তুমি এলে বাসায়। মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করলে, খালামণি, পণ্ডিতটা গেছে কই? বাসাটা যেন বেশ নিরিবিলি লাগছে।

মা হেসে বললেন, ও মনে হয় একটু ঘুমিয়েছে।

তুমি বেশ অবজ্ঞার সুরে বলে উঠলে, ওর তো শুধু ঘুম আর ঘুম...এবং আড্ডা, কি যে করবে!

তারপর মনে হলো ভাইয়ার রুমের দিকে আসছো। আমার রুমের সামনে কি থমকে দাড়ালে, নাকি আমার মনের ভুল! প্রচণ্ড কষ্টে কাদতেও পারছি না। হালকা একটা পরশ মনে হলো আমার কপালটা ছুয়ে গেল তা কিভাবে সম্ভব...? থাক না, এটা যদি মনের ভুল হয়। তাই চোখ থেকে হাত সরালাম না। খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো অনেকদিন পর একটু ঘুমিয়েছিলাম।

পরীক্ষা শেষ হলো। এর মধ্যে তুমি আসোনি। কিন্তু বুঝতাম তুমি ফোনে খোজ নিতে আমার পরীক্ষার।

পরীক্ষা শেষ হলে খালামণি ফোন করে বললেন, এবার কয়েকদিন এসে থাক না আমার বাসায়।

মনে মনে বললাম, খালামণি, আমার তো যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভয় পাই আবেগটা যদি প্রকাশ পায়।

কোনো উত্তর দেয়ার আগেই শুনতে পেলাম তুমি পাশ থেকে বলছো, মা, ওই ঝগড়াটে স্বভাবের মেয়েটা যদি আমাদের বাসায় থাকতে আসে তবে আমি খালামণির বাসায় চলে যাবো। খালামণি বকা দিলো তোমাকে।

আমিও রেগে বলে দিলাম, খালামণি, তুমি তোমার ছেলেকে বলে দাও, ওর সঙ্গে ঝগড়া করার মতো সময় আমার নেই আর অমন ঝগড়াটে স্বভাবের ছেলের সঙ্গে আমার কোনো কথাই নেই।

খালামণি হেসে বলে উঠলেন, আচ্ছা বল তো তোরা কি বড় হবি না? এখনো ছোট বাচ্চার মতো ঝগড়া করিস। মনে আছে, নানাবাড়ি গেলেও তোদের অত্যাচারে সবাই তটস্ত থাকতো। রাজু যদি বলে দুপুরে মাছ খাবো তবে নিশ্চিত তুই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠতি, আমি মুরগি খাবো। অবশেষে তোদের জন্য দুটোই রাধতে হতো। তোদের জেদ কি কখনো কমবে না। একটুও কি কমবে না তোদের ঝগড়া?

বুয়েটে ভর্তি হলাম। সবাই খুশি। যাক, তোমাদের মেধার ধারাটা ধরে রাখতে পেরেছি। ক্লাসের বেশ চাপ বেড়েছে, টার্ম পেপার রেডি করতে হয় আর প্রতিনিয়ত ক্লাস টেস্ট তো দিয়েই চলেছি।

তোমারও ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা সামনে। ইদানীং বাসায় আর তেমন আসো না। ক্যাম্পাসে মাঝে মাঝে দেখা হয়। সোয়েটারটা তখনো আমার কাছেই রয়েছে। প্রচণ্ড কষ্টে মাঝে মধ্যে ওটা বের করে তোমার কথা ভাবি।

হুট করে বাসায় কয়েকজন মানুষের আবির্ভাব ঘটে। মেয়েদের সিক্সথ সেন্স থেকে বুঝতে পারলাম কেন এসেছেন তারা। আমি প্রচণ্ড রাগে চিৎকার-চেচামেচি করলাম বাবা-মার সঙ্গে।

কিন্তু খালামণি এসে বললেন প্লিজ মা, একবার শুধু দেখা করে আয়, তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। তেমন কিছু না। হুট করে যখন এসেই পড়েছে।

তুমি বলে উঠলে, প্যাচার মতো মুখটা নিয়ে ঘুরে আয়। আর এতো ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে কেউ পছন্দ করবে না।

তুমি এমন একটা হাসি হাসলে যে, আমি দুমদাম শব্দ করে রুমের দরজা লাগিয়ে দিলাম। নীল জামদানিটা পরার পর নিজেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম আয়নার দিকে। নিজেকে এমন করে দেখিনি কখনো। সবাইকে

অবাক করে দিয়ে ঠিক বিশ মিনিট পর রুমের দরজা খুললাম। খালামণির সঙ্গে বসার রুমে দেখা করতে গেলাম। শুনতে পেলাম... তুমি আড্ডা দিচ্ছো ভাইয়ার রুমে...। তুমি এতো নিষ্ঠুর কেন?

যাবার সময় ওরা আমার হাতে রিং পরিয়ে গেল।

সবকিছু ঘোরের মধ্যে ঘটে গেল। ছেলের বর্ণনা শুনে মনে হলো যেন সবাই রাজপুত্র পেয়ে গেছে হাতের লাগালে। রুমের দরজা লাগালাম। তোমার সোয়েটারটায় মুখ ঢাকলাম কিন্তু কাদতে পারলাম না। কেন? আমি তো পারবো না তোমাকে জানাতে...।

একে একে সবাই চলে গেল, বাসাটা নিরিবিলি হয়ে গেল। মধ্যরাতে ফোন করলাম তোমার ফোনে। আমি জানি, তুমি এখনো ঘুমাওনি। মনে হলো... বিরক্ত হয়ে ফোন ধরলে। তোমাকে কি জানিয়ে দেবো সব কিছু। কিন্তু তুমি যদি এটা জোকস মনে করে হেসে উড়ে দাও কিংবা অবজ্ঞা করে ফোন রেখে দাও। তাই রিসিভারটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখলাম।

এটা নতুন কিছু নয়, প্রায় প্রতিরাতেই তোমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য ফোন করি। আগের মতো সেদিনও তুমি কয়েকবার হ্যালো... হ্যালো বলে ফোন রেখে দিলে। তুমি কি একটুও বোঝনি সেদিন... খুব বেশি কেদেছিলাম আমি। মনে হয়েছিল...সব কিছু তুচ্ছ করে তোমার কাছে চলে যাই। তারপর বলি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে, প্লিজ, একটু ধরো না হাতটা শক্ত করে। তুমি কি আমায় একটু...।

এরপর বিয়ের আগের রাত পর্যন্ত তোমাকে ফোনে জানাতে চেয়েছি পারিনি। প্রতিটি রাতের শেষ প্রহরে দূরের আকাশের তারাটি সাক্ষী রেখে শুধু তোমাকেই চেয়েছি। এতো অভিমান তোমার ওপর জমা হলো যা এক জীবনে শেষ করা যাবে না। বিশ্বাস করতাম সেই কোটেশনটা, কাউকে যদি তুমি হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি কর, তবে সেও তোমাকে উপলব্ধি করবে। মিথ্যা...! সব কিছুই ভুল। তুমি বুঝলে না, কেউ তোমার জন্য এক জীবন অপেক্ষা করে রইলো।

গায়ে হলুদের দিন তুমি মেরুন একটা পাঞ্জাবি পরেছিলে। এটা যে কাউকে এতো সুন্দর লাগবে তা তোমাকে না দেখলে জানা হতো না। সেদিন রাতে আমার বাধ ভাঙা কান্নার একমাত্র সাক্ষী রইলো তোমার সোয়েটারটা। এটা আর কখনো তোমাকে দেয়া হবে না। ইচ্ছে ছিল ছোটবেলা থেকে যে টুকরো টুকরো ভালোবাসা ও স্মৃতিচিহ্নগুলো জমা করে রেখেছিলাম তা সেই বিশেষ রাতে প্রকাশ করে তোমাকে চমকে দেবো। সেই সুইট সিক্সটিন থেকে প্রতিটি ভালোবাসা দিবসে তোমার জন্য গিফট কিনে রেখেছি। কিন্তু দেয়া আর হয়নি।

বিয়ের দিন সকালে তুমি এলে আমার রুমে..., চুলগুলো এলোমেলো...।

বললে, বুড়ি, মাফ করে দিস। তোকে অনেক বকা দিয়েছি। তুই তো অনেক দূরের হয়ে যাবি। তবে বদলে যাস না।

কথাগুলো শেষ করে তুমি আর দাড়াওনি। আমার কোনো উত্তর শোনার সময় আর হয়নি তোমার। শুধু মনে মনে বলেছি, আমি তো দূরে যেতে চাইনি, তুমি-ই পর করে দিলে আমাকে।

একটুও কাদিনি বিয়ের আসরে। চলে এলাম শ্বশুরবাড়িতে। তারপর সময় বয়ে চলে।

এক সময় পড়াশোনা করার জন্য আমি আর সে ভালো অফার পেয়ে লন্ডন প্রবাসী হই। এবং রাজুভাইয়া ঢাকায় একটা ভালো প্রাইভেট ফার্মে জব করছেন। বিয়ের জন্য পাত্রী খুজছে সবাই। এবার দেশে আসার পর আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে সেই পাত্রী খোজার। কিন্তু রাজুভাইয়ার সেই স্বভাব এখনো বদলায়নি তাই তো স্বাভাবিকভাবেই শুনতে হয়েছে, ও যাকে পছন্দ করবে তাকে তো প্যাচার মতো হতে হবে আর পৃথিবীতে প্যাচার মতো দেখতে একজনই (!) আছে। আমিও চিৎকার করে বলে উঠি, আমি পারবো না তোমার বৌ খুজে দিতে।

সে উত্তরে বলে, যা পণ্ডিত, তোকে আমার দরকার নেই। আমার বৌ আমি নিজে খুজবো।

আমাদের বাসার আমার সেই রুমটা ঠিক আগের মতোই আছে আর আছে সেই সোয়েটারটাও। এখনো মাঝে মধ্যে মন ভালো না থাকলে মনেরও অজান্তে ফোনের রিসিভারটা উঠিয়ে তোমার নাম্বারে ফোন করি...। বাংলাদেশে এলে মাঝে মধ্যে আমার কান্নার সাক্ষী হতে হয় তোমার সেই সোয়েটারটাকে।
রাজুভাই, তুমি জানো না...,সেদিন সন্ধ্যায় সোয়েটারটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়নি কিংবা আমি ভুলে কোথাও রেখেও আসিনি। ওটা আজও আমার কাছে অতি মূল্যবান সম্পদের মতো সংরক্ষিত আছে তোমার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে।

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*
*Kumu@soon.com*

# পেয়ার (Pay R)

নুরে আলম

**প্রেম, পেয়ার** বা **রোমান্স** সবগুলো শব্দের মধ্যেই **'র'** ধ্বনিটির উপস্থিতি রয়েছে। প্রেম বিষয়ক অনেক কিছুর সঙ্গেই এর বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান।
প্রেম বা রোমান্স করতে গেলে **রঙ্গরস** করা অত্যাবশ্যকীয় এবং তার জন্য **রসবোধ** বিশেষ প্রয়োজন। **হৃদয়ে দরদ** না থাকলে প্রেমে সাফল্য আশা করা যায় না। নরের জন্য নারীর **অন্তরে কদর** ও **গুরুত্ব** এবং নারীর জন্য নরের হৃদয়ে **আকর্ষণই** প্রেমের জন্ম দেয়, লালন করে ও মহত্ব দান করে।
প্রেমের সম্পর্কে অনিবার্য বাস্তবতা হলো, **ঝগড়া** বা **quarrel**–এর, যা প্রেমকে দেয় **মধুরতা।** সেই সঙ্গে তা থেকে **উত্তরণের** জন্য দরকার হয়ে পড়ে **উদারতা** তথা **compromise**–এর। তবে সব কিছুর মাঝে এক ধরনের **রহস্যময়তা** থাকলে তা আরো **হৃদয়গ্রাহী** হয়।
প্রেমের **খাতিরেই সংসারে** নর এবং নারী উভয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের **প্রয়োজন** রয়েছে। যেমন **বাড়ি- গাড়ি, শাড়ি- কাপড়, অলংকার** প্রভৃতি। সর্বোপরি এগুলো অর্জনের জন্য দরকার **অর্থ, সামর্থ।** তা যখন একজন বা উভয়ের যৌথ **প্রচেষ্টায় অর্জিত** হয় তখন তা **রোমান্সের** মাঝে আনে **পরমানন্দ।** কোনো অভাব, সমস্যা বা প্রয়োজনের সময় বিশেষভাবে দরকার হয়ে পড়ে **ধৈর্যের।** তবে সব কিছু ছাপিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন **আদরের।**
প্রেমে **প্রতারিত** হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা যদিও তা অনেক **দুর্ঘটনার** কারণ হয়। প্রেমে **ব্যর্থতা** দেখা দিলে **গলায় দড়ি দেয়ার** ভাবনা অনেককেই পেয়ে বসে এবং অনেকে তা কার্যকরও করে। অবশ্যই এটা মোটেও কাম্য বা উচিত নয়। এর থেকে বেচে থাকতে সবাই সবার জন্য **প্রার্থনা** করা উচিত।
সুতরাং সারসংক্ষেপে বলা যায়, **পেয়ার** পাওয়ার জন্য এবং তা **ধরে রাখার** জন্য দরকার Pay **R (Respect** and **Resource)** and be a good **PAIR.**

*ল্যাবরেটরি রোড, ঢাকা থেকে*

# বড় সত্যি

ভালোবাসা শব্দটির গভীরতা যে কতোটুকু তা কেউ ভালো না বাসলে বুঝবে না। তবে কিছু কিছু ভালোবাসা হয় খুব কষ্টের। আসলে ভালোবাসা কোনো কিছুই দেখে হয় না। কেমন করে যেন হয়ে যায়। তাই তো আমার ভালোবাসাটুকু শত প্রতিকূল, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হয়ে গেল।

সে আমার থেকে পাচ ছয় বছরের ছোট। অসম এই সম্পর্কটুকু হওয়ার ক্ষেত্রে তার অনেকখানি হাত ছিল। আমি তার অসম্ভব রকমের সুন্দর ফিলিংসের কাছে হার মানলাম *না* সত্ত্বেও। এতে আমার কোনো কষ্ট নেই। কারণ, এর থেকে সুন্দর মনের ছেলে আমার জীবনে হয়তো বা আসতো না।

আমার এতো বছর জীবনে কখনো কারো সঙ্গে জড়াইনি। জড়ালাম বড় অসময়ে যখন আমার জন্য আমার ফ্যামিলি প্রতিনিয়ত ভাবছে। আমি জানি, আমার ভালোবাসার গ্রহণযোগ্যতা কারো কাছেই দাড় করাতে পারবো না। কখনো তার কাছে যেতে পারবো কি না তাও জানি না। সেটা ভেবে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি তাকে প্রচণ্ড রকমভাবে অনুভব করি। আমার জীবনে আর কেউ আসবে না এটা ঠিক।

তার ভালোবাসা সব থেকে ঊর্ধে এবং সুন্দর। সেও আমাকে খুব ভালোবাসে। তার অনুভূতি, সব কিছুই খুব কাছ থেকে দেখেছি। আসলে কিছু কিছু সুখ, স্বপ্ন, অনুভূতি মনে হয় অনুভব করা যায়। কিন্তু তাকে ছোয়া যায় না, পাওয়া যায় না।

আমি মন থেকে তাকে চাই। খোদা ছাড়া আমাকে কেউ দিতে পারবে না। বয়সের দিক থেকে আমরা অনেক দূরে। কিন্তু মনের দিক থেকে অনেক অনেক কাছে। দুজনের চাওয়া–পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক মিল।

আসলে মানুষের ভুল জায়গাগুলোতেই মনে হয় ভালোবাসা হয়। আমার এই ভালোবাসা আমাকে যতোটুকু অনুভূতি দিয়েছে, না পেলে তারচেয়ে বেশি কষ্ট দেবো। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। এটাই সত্যি। আমার জীবনের অনেক বড় সত্যি সে। তাকে ভোলা যায় না।

*নাম ঠিকানা বিহীন*

# ষাট ঘণ্টা

– জসিমন আলম

ভাই, আপনারা কি বাংলাদেশি?

জি বলতেই যুবকটি বলে উঠলো, আমি চট্টগ্রামের। সে বললো, আমার ছোট বোনসহ আলিগড় যাবো। কিন্তু সেখানকার কোনো টিকেট না পেয়ে দালালের কাছ থেকে *অগ্রগামী* ট্রেনের টিকেট নিলাম। কিন্তু ট্রেনে উঠে দেখি আমার সিট এক কামরায়, আমার বোনের সিট অন্য কামরায়। আঠারো ঘণ্টার এই জার্নি নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আপনারা যদি একজন গিয়ে আমার বোনের সিটে বসেন তবে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

বেলজিয়াম–এর ভিসা করানোর জন্য আমরা যাচ্ছিলাম কলকাতা থেকে আগ্রা হয়ে দিল্লি। ট্রেনে উঠেই অপরিচিত, অথচ একই দেশের এক ভাইয়ের বোনকে নিয়ে চিন্তাযুক্ত মনকে নিশ্চিন্ত করতে বললাম, ঠিক আছে, আপনার বোনকে এখানে নিয়ে আসেন। আমার এক বন্ধু গিয়ে আপনার বোনের সিটে বসবে।

কথাটি শেষ না করতেই সে উঠে গিয়ে বোনকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

মেয়েটি সালাম দিয়ে বললো, আমার নাম সুইটি। আলীগড় ইউনিভার্সিটির ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। এখন রেজাল্ট আনতে যাচ্ছি।

এমন সময় এক হকার *চা, চা* বলে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

বললাম, চা চলবে তো?

মেয়েটি ছটফটে। বললো, তাহলে তো ভালোই হয়।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হলো সে আমাদের কতো দিনের চেনা!

তারপর বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে গভীর রাত হয়ে গেল বুঝতে পারিনি। এবার শোবার পালা। তিন তলা বিশিষ্ট সিটে সবার উপরে আমি, সুইটি দোতলা এবং তার ভাই নিচে। লাইটের সুইচ অফ করে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন দেখলাম ঘুম আসছে না তখন চিন্তা করলাম বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।

তিন তলার সিট থেকে নিচে নামতেই আমার হাতটা যে কিভাবে সুইটির উচু বুকে চাপ লাগলো তা নিজেই বুঝতে পারিনি। নিজে যেমন শিহরিত হলাম তেমনি আশংকা হলো সুইটি কি বলে! তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে যখন বাথরুমে গেলাম, তখনো আমার শরীর কাপছিল।

বাথরুম সেরে যখন উপরে উঠছি তখন লক্ষ্য করলাম, সুইটি আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার উচু বুকে চাপ দিয়ে রাখলো। টানা টানা উত্তেজনার মাঝে কয়েকটা চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুইটি উপরে উঠে আমার বুকে ওপর শুয়ে ঠোটটি আমার ঠোটের ওপর চেপে ধরে রইলো। আমার হাতের বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে ইশারা করলাম নিচে নেমে যাওয়ার জন্য। কারণ তার ভাই বা অন্য কেউ দেখলে সমস্যা হবে।

সে নিচে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রেনের কামরায় বন্ধুরাসহ সবাই নাশতা খাওয়ার সময় সুইটির সঙ্গে কথা বলার সময় কিছুটা সংকোচ লাগছিল।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম সুইটি নরমাল। বুঝলাম তার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই নয়।

সারা দিন ট্রেনে গল্পের মধ্যে বেশ ভালোই কাটলো। রাত এগারোটায় যখন আগ্রায় পৌছালাম তখন আর দিল্লিগামী কোনো ট্রেন নেই। সুইটিকে বললাম, আমাদের সঙ্গে হোটেলে থেকে যাও।

সবাই গিয়ে স্টেশনের পাশে একটা হোটেলে উঠলাম। সুইটির জন্য একটা সিঙ্গল রুম, আমাদের চারজনের জন্য দুটো ডাবল রুম ঠিক করলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষে সুইটিকে তার রুমে পৌছে দিয়ে আসার সময় বললাম, রাতে আসবো।

কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। নিজের রুমে এসে লাইট অফ করে শুয়ে থাকলাম। সুইটিকে পাশে পাবার জন্য মনটা ব্যাকুল ছিল।

ঘণ্টা খানেক পরে উঠে গিয়ে সুইটির রুমের দরজায় টক টক শব্দ করতেই সে দরজা খুলে বললো, তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো। কেউ দেখলে সমস্যা হবে।

মনে হলো সে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিল। তারপর তাকে আদর করতে করতে সিঙ্গল খাটে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লাম।

নিজেকে আমার কাছে সপে দেয়ার সুইটির সে কি ব্যাকুলতা! মনে হলো আগ্রা-তে ভালোবাসার এক অদৃশ্য আকর্ষণ আছে। এ কারণে সম্রাট শাহজাহান তার প্রেয়সীর জন্য *তাজমহল* বানিয়েছিলেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা তার সঙ্গে থাকলাম। সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। সারা দিনের ভ্রমণের ক্লান্তি আর সুইটির সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের পরে সে যতোটা নিস্তেজ হয়েছিলাম তারচেয়ে বেশি উৎফুল্ল লাগছিল এক অজানা আকর্ষণে।

সকালে সবাই মিলে ট্যাকসি নিয়ে গেলাম তাজমহলের দিকে।

গেটে টিকেট কাটার সময় সুইটি বললো, সে এর আগেও এখানে এসেছে।

টিকেট নিয়ে সুইটির হাত ধরে বললাম, আজকে তুমি আমার গাইড। কোথায় কি আছে তুমি আমাকে দেখাবে।

এই প্রথম তার ভাইসহ বন্ধুদের সামনে সুইটির হাত ধরলাম।

বন্ধুরা বলে উঠলো, তুমি আমাদেরও গাইড।

একে একে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে দেখতে মনে হলো সম্রাট শাহজাহানের ভালোবাসার পরশ যেন কপোত-কপোতিনীদের নতুনভাবে ভালোবাসার আগ্রহ সৃষ্টি করছে।

আমিও নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। সুইটির হাতে চাপ দিয়ে তাজমহলের সামনে দাড়িয়ে বললাম, তুমি শুধু আমার হয়ে যাও। তোমার জন্য হৃদয়ে *সুইটিমহল* নির্মাণ করে আমাদের ভালোবাসাকে জন্ম থেকে জন্মান্তর স্থায়ী করে রাখবো। শুধু ভোগ করে নয়, আমার ও তোমার ভালোবাসা স্মৃতি জাগানিয়া হয়ে অটুট থাকবে।

একটানে কথাগুলো বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম সুইটির চোখ পানিতে জ্বল জ্বল করছে। সে আমার চেয়েও বেশি আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। আমার মাথাটা তার বুকে চেপে ধরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো।

পেছন থেকে বন্ধুরা এসে হাততালি দিতেই চৈতন্য ফিরে পেলাম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পথ চলা শুরু করলাম।

তাজমহল যতোই দেখছি ততোই একে আরো দেখার আকর্ষণ রয়ে যাচ্ছে।

তারপর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে এসে লাগেজ নিয়ে স্টেশনে পৌছালাম। ট্রেনের টিকেট কেটে দিল্লিতে পৌছে বিদায়ের পালা। আমরা যাবো হোটেলে আর সুইটি ও তার ভাই যাবে আলিগড়।

ষাট ঘণ্টার ভালোবাসার সঙ্গী সুইটিকে বিদায় জানাতে হবে। জানি না আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হবে কি না।

আবেগে সুইটি কথা বলতে পারছে না। সুইটি যেন পাথর হয়ে গেল। একটা কাগজে নাম ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিতে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলো না। শুধু বললো, চট্টগ্রাম এলে বাসায় আসবেন।

বললাম, ঠিক আছে।

অথচ আমি জানি ভিসা নিয়ে বেলজিয়াম এলে কতো বছর পর দেশে যেতে পারবো তা একমাত্র আল্লাহ জানে। তবুও ভরসা দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম।

আজও সুইটির ভালোবাসা বুকে নিয়ে বেলজিয়ামে আছি।

*ব্রাসেলস, বেলজিয়াম থেকে*

# আকাশ পথে

– মোবারক হোসেন

কয়েক বছর আগের ঘটনা। সামনে ঈদুল আজহা অর্থাৎ কোরবানির ঈদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব। কোরবানির ঈদ ঘনিয়ে এলেই বাংলাদেশ থেকে আমার বড় ভাই হাবিবউলাহ ও প্রিয় ভাতিজা আতিকের টেলিফোন প্রায়ই পেতে থাকি। ঘন ঘন টেলিফোন করার অর্থ দেশে যাবার তাগিদ। কোরবানির ঈদটা যেন তাদের সঙ্গে করি। সত্যি বলতে কি, আমি তো অপেক্ষায় থাকি তাদের টেলিফোনের জন্য। কারণ, দেশ থেকে তাগাদা দিয়ে টেলিফোন এলে স্ত্রী ও মেয়েদের কাছ থেকে সহজেই ছুটি মঞ্জুর হয়।

বলা বাহুল্য, একান্ত ইচ্ছা হয় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঈদে দেশে যেতে। ছোটখাটো ব্যবসা ও মেয়েদের স্কুলের ছুটির কারণে স্ত্রী ও মেয়েদেরকে সঙ্গে নিতে পারি না। ফলে ঈদের দিনটিতে শত আনন্দ ও কোলাহল পরিজন বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো উদাস হয়ে উঠি। বারে বারে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস। নিজেকে কখনো স্বার্থপর, অপদার্থ – কখনো কখনো অসহায়, শক্তিহীন মনে হয়।

ঈদে দেশে যাবার নেপথ্যে আরো একটি বড় কারণ হলো মা। ঈদের দিনটিতে চার ভাইকে খাবার টেবিলে এক সঙ্গে দেখলে সত্তরঊর্ধ মা খুব খুশি হন। আমার প্রচণ্ড ভালোলাগে ঈদ উপলক্ষে আত্মীয়–পরিজন, প্রতিবেশী, পরিচিতজন, শিশু–কিশোর বয়সের সকল বন্ধু–বান্ধবদের সঙ্গে পথে–ঘাটে, বিশেষ করে নামাজের মাঠে সাক্ষাত হলে। তাই প্রতিটি ঈদে আশায় থাকি জরুরি তলবের। বিশেষ করে ভাতিজা আতিকের।

আতিক আবার আমার স্ত্রীর খুব বেশি স্নেহভাজন। সাজেদার কাছে আমার যাওয়া নিয়ে আতিক আর্জি পেশ করলে সাজেদা না করতে পারে না। শত ব্যস্ততা, ঝামেলা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। যদিও চোখের জলে গাল ভাসে। রাগ, দুঃখ, অনিন্দ্রায় রাত কাটায়।

সে বছরও ঈদের সপ্তাহ খানেক আগে তলব আসে দেশে যাবার জন্য, তড়িগড়ি করে, টিকেট কনফার্ম করে ঈদের দুই দিন আগে বাংলাদেশ বিমানে ফ্র্যাংকফুর্ট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। টার্মিনালে ঢাকাগামী পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়। বিমানে ঢোকার আগে সর্বশেষ চেকিং কাউন্টারে সাত আট বছরের মেয়েসহ এক ভদ্রমহিলার লাগেজে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হয়। অর্থাৎ তিনি পারছিলেন না একা। এই মহৎ কর্মটি প্রায় সব যাত্রীই সাধ্যমতো লালন করে থাকেন। আমিও ব্যতিক্রম নই। আমিও অনেক সময় অন্যের কাছ থেকে এই সেবাটি নিয়েছি।

নিয়ম মাফিক ঘণ্টা খানেক লেট করে বিমান আকাশে ওড়ে। ঈদের আগের ফ্লাইট বলেই প্লেন প্যাসেঞ্জারে ভর্তি। হাটা-চলার সুবিধার জন্য সর্বদাই ভেতরের সারির পাশের সিটটি নিতে চেষ্টা করি। কারণ দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিনারের সিট থেকে কাউকে বিরক্ত না করে যখন তখন ওঠা যায়। বসে বসে বোরিং ফিল করলে হাটা-চলা করি। পরিচিত কেউ থাকলে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি। প্লেনে দীর্ঘ যাত্রা আমার কাছে বিরক্তিকর।

টার্মিনালে ফেলে আসা সাজেদা, মামুন, সূচনা, সুরভি, এলি-র কান্নাজড়িত মুখ কল্পনা করছিলাম, বিশেষ করে এলির। সে হয়তো অপেক্ষায় আছে হাতের লাগেজ প্লেনে রেখেই তাকে নিয়ে যাবো। সে রকম প্রতিশ্রুতি দিয়েই ইমিগ্রেশনে ঢুকেছি।

তার কাপড়-চোপড় ভরে ছোট একটি ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে এসেছে, বাংলাদেশে যাবে বলে। স্বভাবতই এসব ভেবে চোখটা ঝাপসা।

এমন সময় একই সারিতে পাশের নারী সহযাত্রীর কথায় আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়। মহিলা কলকাতায় যাচ্ছেন, ঢাকা ট্রানজিট, সঙ্গে বয়স্ক স্বামী। কিন্তু স্বামীটি সিট পেয়েছেন কয়েকটি সারির পেছনে। অনুরোধের সঙ্গে জানালেন, আমি যদি পেছনের সিটে যাই তাহলে তার স্বামী আমার আসনে এলে তার ভ্রমণটা আনন্দময় হয়। একটু কৌতুকের সঙ্গেই তাকে স্মরণ করিয়ে দিই, বাংলাদেশের লোকেরা উদার, অন্যদেরকে খুশি করতে পারলেই বাংলাদেশিরা আনন্দিত। আপনারা ফারাক্কার পানি না দিলে কি হবে, আমি কিন্তু আপনার আনন্দের জন্য আমার কষ্ট করে পাওয়া আসন ছাড়তে রাজি আছি।

আমার উক্তিতে সুন্দরী মহিলা যেমন লজ্জায় রাঙা হলেন তেমনি আনন্দের ঢেউও তার চোখে-মুখে ভেসে উঠলো।

ভদ্রমহিলার স্বামীর সিটে গিয়ে বসি। এই আসনটি অপেক্ষাকৃত ভেতরে।

ভদ্রলোক আমার আসন দখল করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন।

কাকতালীয়ভাবে আমার আসন হয় টার্মিনালে সাহায্য করা ওই মা ও মেয়ের সারিতে। আমাদের মধ্যে এক শাদা চামড়ার বিদেশি। তাই টুকটাক কথা বলতে অসুবিধা। ভদ্রমহিলার অনুরোধে বিদেশি আমার আসনে চলে আসেন তারটি আমাকে দিয়ে। এখন পরস্পরের মতবিনিময়ে আর অসুবিধা নেই। আমিও পুলকিত হই ভদ্রমহিলার আগ্রহ দেখে। অল্পতেই পরিচয় শেষে আলাপ জমে ওঠে।

ভদ্রমহিলার নাম শিমুল বা রুমি। অর্থাৎ বকুল, সেতু, মণি ইত্যাদি নামের মতো তার নামটিও উভয় লিঙ্গ। মেয়েকে নিয়ে দেশে যাচ্ছে শিমুল। থাকবেন তিন মাস। জার্মানি-র মানহাইম শহরে থাকেন। স্বামী একটি রেস্টুরেন্টের কুক বা বাবুর্চি। সিলেটের মেয়ে। সম্ভবত এমসি কলেজের ছাত্রী ছিলেন। মাস্টার্স। ছোটখাটো গড়ন, খুবই স্মার্ট এবং সুন্দরী তো অবশ্যই।

মেয়েটারও মায়ের মতো সুন্দর, ডাগর চোখ এবং ভদ্র। কম কথা বলে। কিন্তু খুব গুছিয়ে। অল্প সময়েই আমি তার আংকল হয়ে যাই। জার্মানি-তে বসবাসরত অনেক বাঙালি বাচ্চাদের মতো ভাঙা ভাঙা কৃত্রিম উচ্চারণে বাংলা বলে না, যা আমার কাছে আরো ভালো লাগার কারণ।

জার্মানিতে এমন অনেক পরিবার দেখি যাদের বাচ্চারা বাংলা ভাষা না বলতে পারলে বা কৃত্রিম উচ্চারণ করে বাংলা বললে পিতা-মাতা কেমন যেন গর্ব বোধ করেন। এ জাতীয় পিতা-মাতা অধিকাংশই অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কিংবা রুচিগত দিক থেকে নীচু। অবশ্য টাকার মান উচু থাকলে বা বাংলাদেশ ধনী হলে হয়তো *শান্তিনিকেতনী* বাংলা করায়ত্ব করে তারাই ক্রেডিট নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। গরিব আত্মীয় পরিজনদেরকে নব্যধনীরা পরিচয় দিতে চায় না বা গোপন রাখতে চায়, তারাও তদ্রুপ। শিমুলের মেয়েটি তার ব্যতিক্রম।

পরিচয়ে আন্তরিকতায় শিমুল তার বাল্য, কিশোর, স্কুল কলেজের হাস্য কৌতুককর ঘটনা বলে যায়।

মুগ্ধ হয়ে শুনি। আমিও গল্প ছোট ছোট চুটকি ইত্যাদি বলে তাদেরকে আনন্দ নিই।

এক সময় মা ও মেয়ে দুজনেই আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

প্লেনে আমার ঘুম আসে না। ছটফট করি উঠতে।

শিমুলের পাশের সিটের ভদ্রমহিলার কোলে তিন চার মাসের বাচ্চা। বাচ্চার জন্য আলাদা কোনো আসন নেই। অন্যান্য এয়ারলাইন্সে সাধারণত ঝুলন্ত আসন থাকে শিশুদের জন্য। ভদ্র মহিলা অল্প বয়স্ক সুন্দরী। চেহারার ইনোসেন্ট ভাব স্পষ্ট। আসন আদায় করে নেবে তেমন চালাক নয়। ভদ্রমহিলা স্বামী ছাড়া বাচ্চাকে নিয়ে দেশে যাচ্ছেন। পিতার বাসা মিরপুর বা মোহাম্মদপুর। শিমুল ঘুমিয়ে পরলে আমাকে অনুরোধ করেন যাতে টার্মিনালে, ট্রলিতে ব্যাগ ওঠাতে, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ক্রস করতে সহযোগিতা করি।

মহিলার অসুবিধা দেখে রাজি হই।

ইতিমধ্যে প্লেনে খাবার পরিবেশন করে। শিমুলকে ডাকি না। সে অঘোর ঘুমে। আমিও খাই না। কারণ, খাবার ট্রে খোলার সুযোগ নেই। ট্রে খুললে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে।

কথা প্রসঙ্গে শিমুল জানিয়েছিল ঢাকা থেকে লন্ডন হয়ে তার বড় ভাই ও ভাবী বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন বলে গত কিছুদিন যাবৎ বিশ্রামহীন এবং নির্ঘুম।

তাই তাদের ঘুম ভাঙি না। একটানা ছয় সাত ঘণ্টা ঘুমানোর পর প্লেন বাংলাদেশের আকাশে প্রবেশ করলে তাদের ঘুম ভাঙাই তৈরি হয়ে নেয়ার জন্যই। শিমুলই ইচ্ছা করে তার টেলিফোন নাম্বার দেন সিলেট ও মানহাইম উভয় স্থানের। অনুরোধ করেন যোগাযোগ বজায় রেখে আমরা যেন বেড়াতে যাই।

আমিও বলি আমার মেয়ে সুরভির মানে আপনার মেয়ের চমৎকার বন্ধুত্ব হতে পারে। সমবয়সী সুরভিও চুপচাপ, অতি লাজুক, কম চঞ্চল। ঠিক আপনার মেয়ের প্রতিচ্ছবি।

তারা ঢাকাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সিলেটে পিতার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিকেলে। তার ভাই ঋণখেলাপি সালমান রহমানের বেক্সিমকো-র কর্মকর্তা।

আমি ও আমার ঢাকা এবং জার্মানি-র ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার দিই। আমন্ত্রণ জানাই ছুটি শেষে জার্মানি ফিরে বেড়াতে আসতে।

প্রাণচঞ্চল শিমুল খুব খুশি হন।

ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে ট্রলিতে লাগে, তুলি, শিমুলকেও সাহায্য করি। তিন চার মাসের শিশুর মায়ের যাবতীয় লাগেজ আমার ট্রলিতে তুলে নিই।

আতিক তার প্রভাব খাটিয়ে সর্বদাই ভেতরে চলে আসে। বুকে জড়িয়ে ধরে মুচকি হেসে বলে, দুই দুটি সুন্দরী মহিলা কে?

আমি বলি সহযাত্রী।

আতিক বলে, চাচা আমার ভাগ্যবান। আমাদের একজন জোটে না, আপনার দুজন।

আতিকের বক্র উক্তি শুনেও না শোনার ভান করি। শিমুল তার ভাইদের দেখে আনন্দে লাফাতে থাকেন। বিদায়ের সময় পুনরায় যোগাযোগ রাখার অনুরোধ করে ঢাকার লোক লোকারণ্যে হারিয়ে যান অবলীলায়।

শিশুর মা তার স্বজনদের খুজে পান না। আমাকেও ছাড়েন না।

আমিও আতিক অনুভব করতে পারি এখানে এই প্রচণ্ড ভিড়ে মহিলাকে বাচ্চাসহ ছেড়ে গেলে হাজার ক্ষুধার্ত বিড়াল একটি শুটকি পেলে যেভাবে টানা-হেচড়া করবে, ওনার অবস্থাও তা-ই হবে যা পৃথিবীর অন্য কোনো এয়ারপোর্টে হয় কি না সন্দেহ।

ভদ্রমহিলার চোখে পানি। অশ্রু নীরবে বয়ে যাচ্ছে রক্তিম গাল বয়ে নিচের দিকে। আধঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে আতিক প্রস্তাব করে আপনি না থাকলে, চলেন আমাদের বাসায়। সেখান থেকে আমাদের ড্রাইভার পৌছে দেবে।

মনে হয় এমনতর আমন্ত্রণের অপেক্ষায় ছিলেন ভদ্রমহিলা।

বনানীর বাসায় বাচ্চাসহ মহিলাকে দেখে আমার বড় ভাবীর চোখ ছানাবড়া।

অনুভব করি চোখে-মুখে হাজারও প্রশ্ন, কৌতুক, সন্দেহ।

হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খাওয়া শেষ হলে মহিলাকে ড্রাইভার পৌছে দেয়।

আতিকের তাগাদায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লান্ত শরীর নিয়ে বনানী, বারিধারা, নয়াবাজার ইত্যাদি স্থানে গরু-ছাগলের হাট দেখতে যাই। কিছু গিফট কিনতে গিয়ে টাকাসহ শিমুলের দেয়া ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার হারিয়ে ফেলি। পকেট থেকে উধাও হয়ে যায়। তবু প্রতীক্ষায় থাকি শিমুলের টেলিফোনের।

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ঈদের কয়েকদিন পর ঈদ মোবারক ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিশুর মা টেলিফোন করেন।

বিস্মিত হই শিমুলের টেলিফোন না পেয়ে। অবসান ঘটে না প্রতীক্ষার। আবার পরক্ষণে ভাবি সেও হয়তো হারিয়ে ফেলেছে আমার টেলিফোন নাম্বার, ঠিকানা যেমনটি আমি হারিয়েছি শিমুলেরটা।

*জার্মানি থেকে*

# আনন্দ ও ব্যথা

– সাহারা খান

কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি বিদেশ আসবো। তবে মাঝে মধ্যে কল্পনা করতাম অন্য দশটা মেয়ের মতো যদি আমিও একদিন বিদেশ যেতে পারতাম! বিদেশ থেকে আগত কোনো মহিলাকে দেখে ভাবতাম। এরা কতো সুখী।

আমরা পাচ বোন, দুই ভাই। বাবা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তার আয় দিয়ে ভাইবোন সবাইকে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। লেখাপড়া শেষ করে ভাইবোন সবাই দেশে চাকরি করছেন। বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় চার বোন আর দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়ে যায়।

বাবা চাইতেন বিপদে-আপদে যেন ছেলেমেয়েকে কাছে পান। তাই ভাইদের বিদেশ যেতে দেননি। বোনদেরও বিয়ে দিয়েছেন দেশে চাকরিরত পাত্রের সঙ্গে। দুলাভাই চারজনই দেশে ভালো চাকরি করেন।

বাবার মৃত্যুর পর মা, ভাই-ভাবীদের সংসারে বড় হতে থাকলাম। বিএ পাস করার পর আমিও একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে গেলাম। এদিকে চারদিক থেকে বিয়ের আলাপ আসতে লাগলো।

পরিবারের সবার ছোট হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে আমার প্রতি মা, ভাই-বোনদের ভালোবাসা ছিল বেশি। তারপর সবার ছোট হওয়ায় সংসারের দায়দায়িত্ব আমার তেমন পালন করতে হয়নি। তাই ভাইয়েরা আমার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করলেন ছোটখাটো পরিবার না হলে বড় পরিবারে বিয়ে হলে বোনটা তো শ্বশুরবাড়ির ঝামেলা পোহাতে পারবে না।

অবশেষে আমাদের এক নিকট আত্মীয়ের মারফতে আবু ধাবি-তে চাকরিরত এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। মিডল ইস্টে চাকরিরত পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে পরিবারের অনেকের অমত ছিল।

তবে পাত্র সুদর্শন, শিক্ষিত এবং পরিবারও ছোট। মা-বাবা বেচে নেই। দুই ভাই, দুই বোন। বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। সংসারে শুধু ভাসুর-জা আর তাদের দুই সন্তান। এমন প্রেক্ষিতে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরে সকলে বিয়েতে একমত হলেন।

বিয়ের দশ দিন পর শ্বশুরবাড়িতে আমার সবচেয়ে আপন মানুষ আমার স্বামী বিদেশ চলে গেল। সে বিদেশ চলে যাওয়ায় একা হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ নতুন একটা পরিবেশে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে কিছুটা সময় তো লাগবেই। তবে শ্বশুরবাড়ির সবাই আমাকে খুবই ভালোবাসতেন।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি একটা স্কুলে বদলি হয়ে গেলাম। চাকরিতে ব্যস্ত থাকায় নিঃসঙ্গতা কিছুটা কেটে যায়।

এক দিন, দুই দিন স্কুল বন্ধ হলেই বাবার বাড়ি চলে আসতাম। কোনো ছুটিতে বোনের বাসায়, কোনো ছুটিতে ভাইয়ের বাসায় চলে যেতাম।

তার সঙ্গে প্রায়ই ফোনে আলাপ হতো। তাকে বলতাম, আমাকে তোমার কাছে বিদেশ নিয়ে যাও। দেশে একা আমার ভালো লাগে না।

সে আমাকে বলতো, এই দেশে থাকলে কোনোদিনও তুমি বিদেশ আসতে পারবে না। দোয়া করো যেন ইওরোপে যেতে পারি। তাহলে তোমার এ আশা পূরণ হবে।

আমার স্বামীর আপ্রাণ চেষ্টা, সর্বোপরি আল্লাহর অসীম কৃপায় সে একদিন ফ্রান্সে চলে গেল। সেখানে বৈধ হতে তিন চার বছর লেগে গেল। তারপর একদিন সে খবর পাঠালো আমাকে বিদেশ নেয়ার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পাসপোর্ট রেডি করে আমাকে ভিসা আনতে ঢাকা যেতে হবে।

সেদিন কি যে খুশি হয়েছিলাম বিদেশ চলে যাবো শুনে!

তারপর একদিন বোনের বাসায় ঢাকা গেলাম। সেখান থেকে ভিসা আনলাম।

তিন মাসের মধ্যে আমাকে ফ্রান্সে যেতে হবে। এতোদিন বিদেশ যাওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। কিন্তু ভিসা পাওয়ার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সবাইকে ছেড়ে কেমন করে বিদেশ যাবো?

আমার এতো মায়ার মা, ভাই-বোন যাদের জন্য শ্বশুরবাড়িতে একটা ছুটি কাটাইনি। দুই এক দিনের ছুটি পেলেই যাদের কাছে ছুটে এসেছি, এদের সবাইকে ছেড়ে একা কি করে বিদেশে থাকবো!

একদিকে স্বামীকে কাছে পাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে এতোগুলো প্রিয়মুখ হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে ফ্রান্স রওনা দিলাম।

দেড় বছর হলো ফ্রান্সে আছি। স্বামী ও দুই সন্তান। ছেলে শাহরিয়ারের বয়স পাচ আর মেয়ে সামিরা-র বয়স এক মাস নিয়ে সুখেই আছি।

তবে প্রিয় দেশ, মা, ভাই-বোন, দুলাভাই, ভাবী, বোনপো, বোনঝি, ভাইপো, ভাইঝি, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সবার স্মৃতি যখন চোখে ভাসে তখন শুধু অশ্রু ফেলি।

সপ্তাহে দুই তিনটা টেলিফোন কার্ড কিনে দেশে ফোন করি। তারপরও শান্তি পাই না।

*ক্লিশি, ফ্রান্স থেকে*

# দ্বৈত

– ম.এস. তুষার

ঘটনার শুরু ১৯৮৯ সাল। লজিং নিলাম ওমর মিস্ত্রির গৃহে। গৃহকর্তা একজন অটো ইলেকট্রিশিয়ান। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো জানতেন। কিছুদিনের মধ্যে আমিও সবার মন জয় করে ওই গৃহের একজন সদস্য হয়ে গেলাম।

সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিল আমার। প্রেম কাহিনী দেখতে দেখতে আমার মনের মাঝেও একটি আশা জাগলো। জাগ্রত ও নিদ্রা অবস্থায় স্বপ্ন দেখতাম, আমি এক রূপসী তরুণীর প্রেমিক। আর এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যই লজিংয়ে পদার্পণ। শোনা কথা, লজিং থাকলে নাকি চুটিয়ে প্রেম করা যায়।

আমি মাদ্রাসার ক্লাস ট্রেন–এর ছাত্র। তরুণীরা উপহাস করে বলে আমি নাকি কাঠমোল্লা। তাই পোশাক পরিবর্তন করে প্যান্ট–শার্ট পরা শুরু করলাম।

পোশাক পরিবর্তনের কারণে ছাত্রীদের হাসির পাত্র হলাম। কিন্তু মহাখুশি হয়েছিল তাদের একজনের মা। মানে ওমরভাইয়ের স্ত্রী। তিন সন্তানের জননী হলেও তার রূপে তখনো লাবণ্য ছিল। হঠাৎ কেউ দেখলে ষোড়শী কন্যা মনে করে একবার তাকাবেই। আমি ভুল করিনি। প্রথম দেখাতেই ছাত্রীর বড় বোন মনে করে আপা ডেকেছিলাম। সেদিন থেকেই তাকে আপা বলেই ডাকতাম।

আমি চঞ্চল ও দুষ্টু প্রকৃতির ছিলাম। সারাক্ষণ হাসি, তামাশা, দুষ্টমি করতাম। অবসর সময় আপাও আমার সঙ্গে আড্ডা মারতেন। কেন জানি আমিও আপার সঙ্গে কথা বলার জন্য উদগ্রীব থাকতাম। সুযোগ পেলেই দুষ্টমির ছলে কিলাকিলি, হাতাহাতি করতাম আর আপার রূপ দেখতাম, কি সুন্দর তার হাসি, ঠোঁটের কোণে সারাক্ষণ হাসি লেগেই থাকবো।

একদিন টিফিনের ছুটিতে চলে আসি। ঘরে শুধু আপা। আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টময় হাসি দিয়ে বললেন, তোকে যদি বিয়ের আগে পেতাম!

বললাম, বিয়ের আগে পেলে কি করতেন?

আপা বললেন, তুই দেখতে চাস কি করতাম বিয়ের আগে তোকে পেলে?

হ্যা, দেখতে চাই বিয়ের আগে আমাকে পেলে কি করতেন। মনে মনে পুলকিত হলাম, দেখি কি করে!

তাহলে দেখেন, বলেই আপা দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমার কেন জানি ভয় লাগছিল।

আমাকে অভয় দিয়ে তার বুকে টেনে নিলেন। আমাকে চুমোয় চুমোয় আদর করতে লাগলেন। বাংলা সিনেমার নায়কের মতো আদর করতে লাগলাম। প্রথম নারী স্পর্শ পেয়ে ধন্য হলাম, হলাম সিক্ত আপার প্রেম যুমনায় স্নান করে।

বড় ছাত্রী টুশি। মানে আপার বড় মেয়ে। তার খাতার প্রতিটি পাতায় একটি লেখা দেখতাম, *হয়তো কিছুই নাহি পাব তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালোবেসে যাবো।* মনে করতাম হয়তো টুশিও তার মায়ের মতো প্রেমিক জোগাড় করে ফেলেছে, তার উদ্দেশ্যে এই লেখা। কিন্তু না, সে ওই লেখাটি আমার জন্যই লিখতো। জানতে পারলাম যখন একদিন সে আমাকে বললো, স্যার, আমি আপনাকে ভালোবাসি। কারো সঙ্গে কি আপনার প্রেম আছে?

কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য মনস্ক হয়ে রইলাম। কি উত্তর দেবো? আমি যে তার মাকে ভালোবাসি। তার মায়ের সঙ্গে যে আমার গভীর সম্পর্ক। আমি কি বলে দেবো? না, বলবো না। বললে যে আমার মান–সম্মান যাবে?

আমার সাড়া না পেয়ে আবার বললো, স্যার! আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কি কথা আছে? বলে ফেলো।

না, এখানে বলা যাবে না। নির্জনে, যেখানে শুধু আমি আর আপনি থাকবো।

পরদিন দুজনে চলে গেলাম চান্দগাও আবাসিক এলাকার নির্জন, নীরব এক রাস্তায়। বেশ কিছুক্ষণ হাটলাম পাশাপাশি। নিস্তব্ধতা ভেদ করে টুশির *আই লাভ ইউ* কথাটি আমার কানে এলো।

সৎ সেজে অনেক কিছুই বোঝালাম। তোমার বাবা-মা জানলে আমাকে মন্দ বলবে। লোকে শুনলে কলংক হবে। পৃথিবীতে প্রকৃত ভালোবাসা নেই, আছে শুধু নষ্টামি।

টুশি এসব কথা শুনতে নারাজ। আমার বুকে মাথা রেখে কাদতে লাগলো।

আমি আর কঠোর থাকতে পারলাম না। শক্ত হাতে আমিও তাকে জড়িয়ে ধরি।

ফিশ ফিশ করে বললো, স্যার, এভাবে আমাকে আজীবন ধরে রাখবেন, আমি আপনাকে ছাড়া বাচবো না।

এভাবে মা-মেয়ের সঙ্গে চলতে লাগলো আমার প্রেম। দৈনন্দিন রুটিন ছিল, ভোরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতাম টুশির সারা অঙ্গ। প্রতিদিন টুশির ঘুম ভাঙতো আমার ঠোটের উষ্ণ পরশে। আর দুপুরে আদর সোহাগে ভরিয়ে দিতাম তার মায়ের (আপার) তনুমন। দুজনকেই আমি প্রচণ্ড ভালোবাসতাম।

আপা বলেছিলেন পালিয়ে গিয়ে আমাকে বিয়ে করবেন। আমাকে নাকি গার্মেন্টস-এ চাকরি করে খাওয়াবেন। কলংকের ভয়ে তা আমি করিনি। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম টুশিকে বিয়ে করবো।

আনন্দ ও স্বপ্ন পূরণের আশায় দিন গুণতে লাগলাম। একদিন ক্লাসে কোরআন-এর বঙ্গানুবাদ পড়াতে এসে হুজুর একটি আয়াত বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, *যে নারীর সঙ্গে কোনো পুরুষ দেহ মিলন করেছে ওই নারীর গর্ভে জন্মেছে এমন কোনো মেয়েকে ওই পুরুষের পক্ষে বিয়ে করা হারাম, হোক সে অন্য পুরুষ দ্বারা জন্ম।*

এ আয়াতের সাফ অর্থ, আমার পক্ষে টুশিকে বিয়ে করা হারাম, এখন আমি কি করি? আমি আর ভাবতে পারছি না। চেয়ারে বসে রইলাম।

টুশি এসে বললো, কি ব্যাপার? সাহেবের মান খারাপ কেন। আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

কোনো ভনিতা না করে সরাসরি বললাম, ক্ষমা করে দিও, আমি কাল চলে যাচ্ছি।

টুশি লাফ দিয়ে উঠলো। ভেজা কণ্ঠে বললো, আমি কি নিয়ে বাচবো? আপনি যে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন, কামিল পাস করে আমাকে বিয়ে করবেন।

তোমাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

যদি অসম্ভব হয়ে থাকে তাহলে মিছে ভালোবাসা দিলেন কেন আমাকে? আমি কি দোষ করেছিলাম? আমার জীবনটাকে কেন এলোমেলো করে দিলেন? আপনি একটা বেইমান। পুরুষ জাতটাই খারাপ।

টুশির গালিগুলো হজম করতে গিয়ে বদহজম হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, একমাত্র তোমার মায়ের ভালোবাসার কারণে তোমার-আমার বিয়ে হবে না।

মা আবার কি করলো? মা আপনাকে ছোট ভাই হিসেবে ভালোবাসে।

হ্যা, ছোট ভাই হিসেবে ভালোবাসে। তাই তো আপার ইজ্জত বাচাতে এখান থেকে চলে যাবো। তোমার মুক্তি দিয়ে যাবো, আমি আর কখনো ভালোবাসার দাবি নিয়ে তোমার সামনে আসবো না।

টুশিকে বিয়ে করা হলো না। তাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম বিয়ে করবো, সেই ওয়াদা রাখতে পারিনি। কেন। তাকে এতো ভালোবাসার পরও উপেক্ষা করলাম। সেই কথাটি আজ পর্যন্ত তাকে বলতে পারিনি। সে এখন আমাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে। অন্যজনের ঘরণী হয়ে সুখে আছে কি না জানি না। কিন্তু তার ভালোবাসার স্মৃতিগুলো আজো মনে পড়ে। বড় ইচ্ছে হয় একবার তার কাছে গিয়ে আমার অপারগতার কথা জানিয়ে আসি।

আপা এবং টুশি দুজনকেই প্রচণ্ড ভালোবাসতাম। যদি সম্ভব হতো দুজনকেই বিয়ে করে সংসার সাজাতাম। তাদেরকে এখনো ভালোবাসি এবং আজীবন ভালোবাসবো।

*সউদি আরব থেকে*

# লাবন্য (দ্বয়)+অমিত

– সোমা

আমাকে আর সূচনাকে সবাই বলে মানিকজোড়। কারণ, আমাদেরকে কোথাও একা দেখা যায় না। যদি কাউকে বলি, রাজশাহী আসার আগে আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না তাহলে কেউ বিশ্বাস করে না। যদি বলি স্কুল লাইফের বান্ধবী তাহলে সবাই বলে, হ্যা, এ জন্যই তো এতো মিল।

অথচ অনার্স ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা কেউ কারো নামও জানতাম না। যেহেতু দুজনেই বাসা ছেড়ে মেসে থাকি। তাই খুব একা লাগে। বিশেষ করে বিকেলটা যেন আর কাটতেই চায় না। কি করি কি করি, ভাবতেই একদিন ঠিক করলাম আমরা প্রেম করবো। কিন্তু আমরা যে, দুজন দুই দেহ, এক আত্মা। তাহলে তো আলাদা প্রেম করা সম্ভব না। তাহলে উপায়!

শেষে ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা দুজন মিলে একটা ছেলেকে ভালোবাসবো। তবে হ্যা, এমন ছেলেকে যে আমাদের কখনো আলাদা চোখে দেখবে না। কখনো অযথা হ্যাংলার মতো পিছে পিছে ঘোরাঘুরি করবে না। যখন–তখন এসে কল দিয়ে বিরক্ত করবে না। সে হবে ব্যক্তিত্ববান। আর আমাদের যেহেতু দুজনারই লম্বা ছেলে পছন্দ, তাই হতে হবে লম্বা। এবং তাকে ফর্শা হওয়া চলবে না। কেননা আমরা ফর্শা ছেলে পছন্দ করি না। এবার তাকে খুজে বের করার পালা।

আমরা প্রতিদিন পদ্মার পারে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু কাউকেই আমাদের পছন্দ হতো না। আর আমাদের অতিরিক্ত গম্ভীর মুখ দেখেই হয়তো কেউ সাহসও পেতো না আমাদের সঙ্গে কথা বলার।

শেষে একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম পদ্মার পাড় বাদ এবার কলেজ থেকেই খুজে নিতে হবে। শুরু হলো কলেজে খোজা।

একদিন আমরা কলেজে হেটে যাচ্ছি। এমন সময় নীল শার্ট পরা লম্বা, শ্যামলা একটা ছেলে খুব শান্তভাবে হেটে যাচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়েই সূচনাকে বললাম, দেখ দেখ মনে হয় ওই আমাদের অমিত। আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, তাকে আমরা অমিত বলে ডাকবো। তো সূচনাও তাকে দেখে পছন্দ করলো। খোজ নিয়ে জানলাম, সে ইংরেজি বিভাগের থার্ড ইয়ারে পড়ে।

তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। জানলাম তার নাম তুহিন। তাকে প্রথমে ভাইয়া বলে সম্বোধন করলাম। কয়েকদিন পর তাকে আমাদের কথা বললাম।

সব শুনে একটু হেসে বললো, ঠিক আছে।

শোনালাম আমাদের শর্ত। তা হলো আমাদের কাউকেই কখনো বিয়ে করতে চাইতে পারবে না। কাউকে একা নিয়ে ঘুরতে যেতে পারবে না।

হেসে হেসেই বললো, তোমাদেরকে আমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন শর্তগুলো মেনে নিলাম।

শুরু হলো আমাদের প্রেম।

এখন আমরা আমাদের অমিতকে নিয়ে খুব ভালো আছি। আমাদের অমিত খুব ভালো। সে উন্নত মনমানসিকতার ছেলে। সে কখনো আমাদের অযথা বিরক্ত করে না। আমাদের দুজনকে আলাদা করে দেখে না। এখন আর আমাদের একা লাগে না। মনে হয় এই তো অমিত আছে, আর কিসের ভয়!

*রাজশাহী থেকে*

## সেটলড ম্যারেজ

– নীলাঞ্জনা দাস

লাভ ম্যারেজ নয়, সেটলড ম্যারেজ আমাদের। আমার ভগ্নিপতি অনেক দেখেশুনে এই বিয়ে ঠিক করেছেন। তিনি তখন বরিশাল পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম। বিয়ের সময় তিনি ঝালকাঠি প.বি.স. তে যোগদান করেন। সেই সূত্রে হঠাৎ একদিন জামাইবাবুর (ভগ্নিপতি) অফিসে এজিএম অর্থাৎ তার সঙ্গে দেখা।

এক সঙ্গে নৌকায় নদী পার হয়েছি। এক সঙ্গে অফিসের গাড়িতে বাসায় ফিরেছি। তখন অবশ্য বিন্দুমাত্র বুঝতেই পারিনি যে, আমাদের দুজনের বিয়ে হবে। পরবর্তী সময়ে অফিশিয়াল পিকনিকে আমাদের কথা। দেখা বললে ভুল হবে। কেননা সে আমাকে দেখেছে, আমি তাকে দেখিনি। আমি জানতাম না যে, দেখাদেখির উদ্দেশ্যই আমার বোন ওই দিন ধান্ধাবাজি করে আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ এবং তাদেরকেও ধন্যবাদ। কেননা সেদিন যদি না যেতাম তাহলে হয়তো তাকে আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে নাও পেতে পারতাম।

আমাদের বিয়ে হয়েছে এক বছর ছয় মাস প্রায়। এই বিয়েতে অবশ্য বিভিন্ন কারণে রাজি ছিলাম না। সবার সঙ্গে রাগ করে, ঝগড়া করে বরিশাল থেকে পিরোজপুরে চলে গিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, পিরোজপুরে আমার বাবার বাড়ি। বিয়ের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত ধোপে টিকলো না। অবশেষে বিয়ে। তাকে পেয়ে সত্যি আমি ধন্য। তার মতো উদার মনের মানুষই ছিল আমার কাম্য।

বিয়ের দিন শুভ দৃষ্টির সময় তার দিকে তাকানোর আগেই লজ্জায় হেসে ফেলেছিলাম। তাকিয়ে দেখি সেও মিটি মিটি হাসছে। বিয়ের সময়ের ঘটনাগুলো এখন ভাবতে ভীষণ ভালোলাগে। সেই নতুন নতুন সব ভালোলাগার দিনগুলো যদি পুরনো না হতো তাহলে কতোই না মজা হতো!

বিয়ের পরের একটা হাসির ঘটনা বলি। একদিন শপিংয়ে গেছি। তাকে দুষ্টুমি করে বললাম, আমার পিল ফুরিয়ে গেছে।

শুনেই রিকশা থামালো।

একটা দোকানকে দেখিয়ে বললাম, ওই তো।

সে আমার কথামতো সেদিকে দৌড়ে গেল।

ওমা! ফিরে এলো খালি হাতে।

এসেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বললো, আমাকে তুমি কোথায় পাঠিয়েছো? এটা তো ওষুধের দোকান নয়, একটা ইলেকট্রনিক্সের দোকান।

আমার কথামতো সে দৌড়ে গিয়ে দোকানের আশপাশে না তাকিয়েই দোকানির কাছে সেটা চাইতেই দোকানি তার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিল।

*রূপাতলি, বরিশাল থেকে*

## বোনাস

– নীলাঞ্জনা

বরাবরই ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস নীলার। ভোরে দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারী করে বারান্দা ভর্তি টবের গাছগুলো ছুয়ে ছুয়ে আদর করে সন্তানের মতো। পূব আকাশ লাল হয়ে আরেকটা নতুন দিনের সূচনা হচ্ছে। একটা একটা করে দিন গড়িয়ে বিয়ে জীবনের পচিশটা বছর পার করেছে। একমাত্র পুত্র, কন্যা আর স্বামী নিয়ে সুখের সংসার।

তারপরও কেন সুখী হতে পারে না নীলা সেই উত্তর খুজে ফিরছে পচিশ বছর ধরে। মানুষের মন নামে বস্তুটা কি? একজনকে ভুলতে এতোটা সময় লাগে? সময়ে সব কিছু নাকি ভোলা যায়। তাহলে নীলা পারে না কেন? বরং সন্তানরা যখন ছোট ছিল তখন শত ব্যস্ততায় ভুলেছিল। এখন তারা বড় হচ্ছে। তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর শত ব্যস্ততা এখন হাজারো ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। ফলে দীর্ঘ একাকীত্ব নীলাকে অক্টোপাসের মতো ঝাপটে ধরেছে। এবং একাকীত্বের সঙ্গী সেই একটি মুখ যাকে সে ছেড়ে এসেছিল সেই পচিশ বছর আগে।

নীলার বয়স তখন একুশ–বাইশ আর আসিফের চব্বিশ। পরিচয় বছর দুয়েকে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা আট নয় মাসের। ইউনিভার্সিটিতে সেই দিনগুলোতে দুজনেই তখন রঙিন প্রজাপতির মতো উড়েছিল। একজনকে ছাড়া আরেকজন কিছুই চিন্তা করতে পারে না। আসিফের একটু ছোয়ায় নীলার হৃদয়ে হাজারো গোলাপ ফোটে। তেমনি নীলার একটু হাসিতে আসিফের আকাশে ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্না গলে পড়ে।

এতো সুখ বিধাতার সইছিল না। না হলে কেন এমন ঝড় এলো? দীর্ঘ দিনের অসুস্থ পিতা আর অসহায় মা হঠাৎ সুপাত্র পেয়ে হাতছাড়া করতে চাইলেন না। পায়ের তলায় মাটি যেন সরে গেল নীলার। ছুটে গেল আসিফের কাছে। সদ্য অনার্স পাস করা আসিফ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

প্রচণ্ড রাশভারী পিতার কাছে নীলা সাহস করে আসিফের কথা বলায় তিনি কিছুটা নরম হন। কিন্তু শর্ত একটাই, আসিফদের পরিবার থেকে প্রস্তাব এলে এনগেজমেন্ট করতে হবে অতি শিগগির।

আসিফের তখন হালভাঙা নাবিকের মতো অবস্থা। মাথার ওপর তখনো অবিবাহিত বড় ভাই। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে ভাইদের তত্ত্বাবধানেই মানুষ। স্বভাবসুলভ লজ্জা আর সাহসের অভাবে কিছুতেই পরিবারে কথাটা তুলতে সে পারে না। নীলা তাকে ভালো করে চেনে। তাই ভুল বোঝে না। শুধু দেখতে পায় কিছু না করতে পারার অক্ষমতায় তাকে কিভাবে দগ্ধ করছে। দুজন দুজনকে দোষারোপ না করে নিয়তির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে।

ঝড়ের মতোই নীলাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিয়ের দিন আসিফের কি হয়েছিল জানে না। কিন্তু নীলার অবিরাম চোখের জলে সিক্ত হয়েছিল বিয়ের সারা মুহূর্ত। স্বামীর কর্মস্থল ঢাকার বাইরে যাওয়ার আগে আসিফকে শেষবারের মতো খুব দেখতে ইচ্ছা করলো। ইউনিভার্সিটির সেই নির্দিষ্ট জায়গায় যখন দেখা হলো তখন দুজন দুজনকে তেমন কিছুই বলতে পারে না। শুধু বুঝলো বীণার তারটা ছিড়ে গেছে। সুর আর বাজে না।

এক সময় বিদায় নিয়ে রিকশায় উঠে বসে। কানে বাজতে থাকে আসিফের শেষ কথাগুলো, এটা সত্যি করে জেনো, অন্য কোনো মেয়ে আসবে না আমার জীবনে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে জনারণ্যে। সেই শেষ। আর কোনোদিন দেখা হয়নি। এবং কোনো খোজখবর কিছুই সে জানতো না।

বিশ্বস্ত স্ত্রী, আদর্শ মায়ের সব কর্তব্যই নীলা পালন করেছে। শুধু মাঝে মধ্যে মনটা হাহাকার করে ওঠে। মনে হয় চারপাশে কেউ নেই। কিছু নেই, বড্ড একা মনে হয়। ব্যস্ত স্বামী, রেসের ঘোড়ার মতো ছোটে। সোনার হরিণ তাকে ধরতেই হবে। সন্তানরা মায়ের আচল ছেড়ে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে ব্যস্ত। শুধু ব্যস্ততা নেই নীলার। যখন চোখ পড়ে আয়নায় তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রূপালী চুলের ইশারা। চোখে চশমা উঠেছে। চঞ্চলতা কোথায় হারিয়ে গেছে। ইদানীং মনটা খুব ছটফট করে। সে কোথায়? কেমন আছে? তার দেখার তৃষ্ণা হয়তো মিটবে না আমৃত্যু। রাস্তায় যাবো, দোকানপাটে অবিরাম খুজে ফেরে, মনটা হতাশায় ভরে যায়।

মনে হয় জুয়েল আইচ–এর জাদুর মতো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই আজকাল অপরাধী ভাবে নিজেকে। তার মনটা ভেঙে দিয়ে এসেছিল। মনভাঙা আর মসজিদ ভাঙা নাকি সমান পাপ। দেখা হলে তার হাত দুটি ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতো।

আজকে নীলার কাছে মনে হচ্ছে মানুষ মনেপ্রাণে কোনো কিছু চাইলে আল্লাহ হয়তো বিমুখ করে না। গতরাতে একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে আসিফের আত্মীয়ার সঙ্গে পরিচয়। তার কাছে শুনলো আসিফ ঢাকায় এক মিনিস্ট্রিতে ভালো পজিশনে চাকরি করছে। নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামটি শোনার পর আর কোনো কথা, কোনো শব্দই যেন কানে পৌছালো না। সারা রাত ঘুমাতে পারে না। মনে হয় অসীম সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া একটি মুক্তা খুজে বেড়াচ্ছে। খুজে পেলে এক হবে সেটা আর মাথায় আসে না। মনের ভেতরে তীব্র তাগিদ শুধু তাকে একবার খুজে পেতেই হবে।

অফিস টাইম হতেই টেলিফোন নিয়ে বসে। প্রায় চল্লিশ মিনিট চেষ্টা করে বিভিন্নজনের কাছ থেকে বিভিন্ন নাম্বার পেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন তার নাম্বার পাওয়া গেল তখন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি ধরে বললো, স্যার তো মিটিংয়ে।

ততোক্ষণে প্রায় ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা নীলার। পিএস ভদ্রলোককে শুধু এক মিনিটের জন্য ডেকে দেয়ার জন্য অনুরোধ সে করে।

সেদিনের গ্রহ–নক্ষত্র কোন তিমিরে ছিল জানা নেই। নীলা শুধু জানে, এই ক্ষণটির জন্য পচিশ বছর সে অপেক্ষা করে আছে।

টেলিফোনে একটি ভারী গলা ভেসে এলো।

কিছুক্ষণের জন্য কি জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল নীলার! ইতস্তত করে উচ্চারণ করে, আমি আসিফ সাহেবকে চাইছিলাম।

জি বলছি।

চিনতে পারছেন না?

জি না। দয়া করে বলবেন আপনি কে?

স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে, নীলা। কি? চেনা যায়?

ওপাশে টেলিফোন হাতে শুদ্ধ হয়ে গেল আসিফ। কিছুক্ষণ পর সাড়া পাওয়া গেল।

নীলা! কোথা থেকে কিভাবে? আপনি আপনি করছো কেন?

আসিফের মনে পড়ে মিটিং রেখে এসেছে।

তোমার ফোন নাম্বারটা দাও, পনেরো মিনিট পরে তোমাকে রিং করছি।

দশ মিনিটের মধ্যেই মিটিং ক্যানসেল করে ফোন করে নীলাকে।

বোঝা গেল নীলা সম্বন্ধে আসিফ মোটামুটি অনেক কিছুই জানে।

তোমার সুন্দর জীবনে যেন ছন্দপতন না ঘটে তাই খোজ করিনি। তবে প্রায়ই খুব ইচ্ছা করতো তোমাকে দেখতে।

নীলার প্রচণ্ড অভিমান হয়। গত কয়েক বছর ধরে আসিফকে দেখার জন্য সে কতো অস্থির ছিল তা কি করে ওকে বোঝাবে?

আমি তোমাকে মাফ করবো না। আমি খুজে বের করেছি। কিন্তু তুমি আমার খোজ করোনি।

বেশ, দোষ স্বীকার করছি। আসলে অফিসের ব্যস্ততা আর ভেবেছি তুমি আমাকে ভুলে গেছো।

জানা গেল আসিফ বিয়ে করেছে নীলার বিয়ের প্রায় দশ বছর পর। এখন কয়েক সন্তানের পিতা। বৌয়ের প্রশংসায় খই ফুটছে। ফোনটা নীলা ছেড়ে দিল। কেমন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা খচখচ করতে থাকে।

পর পর কয়েকদিন কথা হয়। নীলা যতোই ভাবে কথা বলবে না, বলা কথা অন্যায়। তবুও নিজেকে দমাতে পারে না। টেলিফোনটা চুম্বকের মতো তাকে টানে। যখন তার সঙ্গে কথা বলে তখন ও ভুলে যায় ও একজন মা, একজন স্ত্রী। মুছে যায় তার গত পচিশটা বছর। তারপরই একটা অপরাধ বোধ এসে গ্রাস করে ওকে। কষ্টে দগ্ধ হয়। এই অবেলায় ওকে কেন খুজে পেল! ওর কাছে যেতে পারবে না, ওকে ছুতে পারবে না, ওকে দেখার অনন্ত পিপাসা তো রয়েই যাবে।

আসিফ প্রায়ই বলে, নীলাকে হারিয়ে ও দশটা বছর কি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছে। আসিফের কষ্ট নীলার মন ছুয়ে যায়। আসিফের জন্য নীলার মনে কষ্ট, যন্ত্রণা একাকার হয়। ওকে দেখতে ইচ্ছা করে, কাছে পেতে ইচ্ছা করে। দুজন দুজনকে দোষারোপ করে, কেন একজন অপেক্ষা করলো না অথবা কেন অন্যজন সাহসী হলো না। তাহলে দুটি জীবনের না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতো না। ভালোবাসা মানে দুটি হৃদয়, মন, দেহের মিলনের সুখ। বিরহেই ভালোবাসা এ শুধু মিথ্যা মনে হয়। নীলার মনে হয় দুজন দুজনকে যদি ভালোবাসে তবে প্রাথমিক অবস্থায় যতো কষ্টই হোক পরবর্তীকালে না পাওয়ার কষ্টে সারাটা জীবন দগ্ধ হতে হয় না।

একদিকে আসিফ, অন্যদিকে স্বামী সন্তান – একা নিজের মনে যুদ্ধ করে প্রায় অসুস্থ হতে বসেছে নীলা। স্ত্রী–সন্তান, অফিসের ব্যস্ততা নিয়ে ভালোই আছে আসিফ। প্রায়ই বলে, চলো আমরা বন্ধু হই। বন্ধুর মতো হোক না আমাদের ব্যবহার।

নীলা পারে না। নীলা যে এখনো ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

একদিন সে এক শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে সব বলে পরামর্শ চায়।

তিনি ওকে বোঝান, তুমি যাকে ভালোবাসতে সে ছিল চব্বিশ বছরের যুবক, সে শুধু তোমার জন্য পাগল ছিল। তুমি তো এই আসিফকে ভালোবাসোনি। ও যদি সাহসী হতো তাহলে তোমাকে ধরে রাখতে পারতো। আসলে ওর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে অসময়ে কোনো দায়িত্ব মাথায় নিতে চায়নি।

নীলা অনুভব করে, এতোদিন আসিফকে ছেড়ে আসার কষ্টের জন্য নিজেকে একা অপরাধী ভাবতো, তা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাচ্ছে। তিনি পরামর্শ দেন, যদি তুমি ওর সঙ্গে দেখা করো তাহলে হয়তো দেখবে পচিশ বছরে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা তোমার চোখে পড়লে মনকে শক্ত করতে পারবে।

দেখা করার জন্য দুজনেই তাগিদ অনুভব করে। নির্দিষ্ট সময়ে একটি রেস্টুরেন্টে ওদের দেখা হয়। অপলকে তাকিয়ে থাকে দুজনেই। দুজনের মনে আকা ছবিটা পচিশ বছরের ব্যবধানে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। নীলার বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে, চোখটাও কি ছলছল করছে?

নীলার হাতের ওপর হাত রাখে আসিফ।

একদিন আসিফের একটু স্পর্শে নীলার হৃদয়ে হাজারো আলো জ্বলে উঠতো। আজ কেমন অস্বস্তিতে হাতটা সে টেনে নেয়। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি। আজ ঢাকা শহরে ওদের দেখা হবার কোনো জায়গা নেই? তার চেয়ে গাড়িতে করে দূরে কোথাও ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল।

গাড়ি আস্তে আস্তে উত্তরার দিকে ছুটে চলে। দুজনেই ওদের ফেলে আসা জীবনের কথা বলে। বিবাহিত জীবনের টুকরো টুকরো কথা।

সে বৌকে খুব ভালোবাসে। আসিফের কথায় তার সুখী জীবনের কথা প্রকাশ পায়।

নীলা অবাক হয়। একজনকে ভুলে আরেকজনকে এতো সহজে কেমন করে ভালোবাসে? তাহলে নীলা কেন পারলো না তার স্বামীকে এতো ভালোবাসতে? ঘর–সংসার, মায়া, মমতা, কর্তব্য এক জিনিস আর ভালোবাসা অন্য জিনিস। নীলার হৃদয়ের একটা অংশ আসিফের জন্য ফাকাই ছিল। ওখানে তো কাউকে সে বসাতে পারেনি। অথচ আসিফ বলেছিল, আর কোনো মেয়েই আসবে না তার জীবনে। খুব কষ্ট হয় নীলার।

জানো, তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম, এখনো ভালোবাসি। তোমাকে হারিয়ে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। বলেই ওকে কাছে টেনে আদর করতে চায়। কেমন যেন চমকে উঠে নীলা! এ যেন সেই আগের আসিফ, যা একান্তই নীলার। পরক্ষণেই কেন যেন মনে হয়। এ শুধু এক পুরুষের নারীর প্রতি চিরন্তন আকর্ষণ।

ঘরে ফেরার জন্য বার বার ঘড়ি দেখে আসিফ। পরবর্তী কথায় কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

তুমি আমার বাসায় কখনো ফোন করো না। আমার পরিবারই আমার কাছে প্রথম, তোমাকে ভালোবাসতাম, এখনো ভালোবাসি। তুমি নাহয় বোনাস হয়ে রইলে।

নীলাকে নামিয়ে দিয়ে একবারও পেছন ফিরে না তাকিয়ে সে চলে যায়। নীলা বুঝতে পারে, ওর হৃদয়ের কোথাও আর নীলা অবশিষ্ট নেই।

বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাদতে থাকে। এই কান্না ভালোবাসা হারানোর কান্না, পরাজিত হওয়ার কান্না। কেন এতো বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হলো? দেখা না হলে অন্তত এই বিশ্বাস নিয়ে বেচে থাকতো, তার চেয়েও ওকে একজন বেশি ভালোবাসে। পরাজিত হওয়ার কষ্ট চোখে অশ্রু হয়ে ঝরতে থাকে। কানে শুধু বাজতে থাকে, *তুমি না হয় বোনাস হয়েই রইলে।*

নীলা বুঝতে পারে, যে হারিয়ে যায়, যা কিছু হারায় তাকে আর খুজে বের না করাই উচিত।

*নাম বিহীন, উত্তরা, ঢাকা থেকে*

# ছোট পাখি

– শাহীন খান

ভালোবাসার এ কাহিনী বেশ পুরনো। আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগের ঘটনা।

আমাদের বিল্ডিংয়ের দোতলায় একটি পরিবার ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল বেশি। সে পরিবারেরই একটি মেয়ে। নাম জানাটা এখানে অর্থহীন।

আমি যখন এসএসসি পরীক্ষার্থী তখন তিনি এইচএসসি পাস করে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। ধীরে ধীরে ম্যাট্রিক পাস করে কমার্স কলেজে ভর্তি হই। মেয়েটি ছিল আমার থেকে চার বছরের সিনিয়র। তিনি আমার পড়ালেখায় বেশ সাহায্য করতেন। ফলে বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দুজনের সম্পর্ক ছিল অনেকটা বন্ধুর মতো।

ইউনিভার্সিটিতে তার অনেক বন্ধু থাকলেও নিজের পরিবারে তিনি ছিলেন অনেকটা একা। ফলে তার জীবনের অনেক ঘটনাই আমাকে অকপটে বলতেন। কখনো তার রুমে কখনো, আমার রুমে আড্ডা জমে উঠতো। বয়সে তার থেকে ছোট হওয়ায় কারো চোখে একটা কোনো দোষের ব্যাপার ছিল না।

ওই বয়সে তিনি ছিলেন আমার চোখে একমাত্র সুন্দরী নারী। প্রতিদিন তাকে একবার না দেখলে আমার ভালো লাগতো না। সেটা কি প্রেম ছিল নাকি অন্য কিছু বুঝতে পারতাম না। শুধু ভাবতাম এ মেয়ে ছাড়া আমার চলবে না। এ মেয়ের জন্য সব কিছু করতে পারি।

একদিন অনেক সাহস নিয়ে তাকে ভালোবাসার কথা বলে ফেলি।

তিনি এ কথা শুনে প্রচণ্ড হেসেছিলেন। বলেছিলেন সেটা কি করে সম্ভব! তুমি তো বয়সে ছোট।

জবাব দিয়েছিলাম, এতে আমার কি দোষ?

পরবর্তীকালে এ বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তিনি প্রায় সময় ঠাট্টা করতেন। আমায় বলতেন, ভালোবাসার ছোট পাখি।

তার রুমে যখন পড়া বুঝতে যেতাম শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

একদিন পড়ার সময় টেবিলের যে পাশে তিনি বসেছিলেন সেই পাশে আমার ডান হাত ঝুলিয়ে ছিলাম। হঠাৎ হাতে নরম কিছু অনুভূত হওয়ায় চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি তার নরম বুক আমার হাতে চেপে বসে আছে। এটা কি করে হলো বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। আমার হাত সরিয়ে নিতে পারিনি। এভাবে দিনের পর দিন তার শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোর ছোয়া পেতে লাগলাম। অজানা এক শিহরণ প্রতিবারই আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক আবেশে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। প্রতিদিন এ মুহূর্তের জন্যই যেন অপেক্ষা করতাম।

একদিন দুপুরে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করি। তিনি যেন এদিনেরই অপেক্ষায় ছিলেন। আমার এ দুটি হাত তার স্তন দুটিকে দলিত-মথিত করছিল।

হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে দরজা বন্ধ করলেন এবং আমাকে কাপড় খুলতে বললেন।

কাপা কাপা হাতে নিজের এবং তার পোশাক খুলে ফেললাম। জীবনে প্রথম নগ্ন নারী দেহ দেখলাম। মনে হলো পৃথিবীর সব সৌন্দর্য বুঝি নারী দেহের মধ্যে। তিনি আমাকে তার বিছানায় শোয়ালেন। চুমোয় চুমোয় তিনি আমাকে ভরিয়ে দিলেন।

তিনি ছিলেন আমার চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। আমরা মিলিত হলাম। আমাকে কিছুই করতে হয়নি। তিনিই সব করলেন। এক সময় দুটি দেহই পরিতৃপ্তি নিয়ে অবসন্ন হলো।

পরবর্তীকালে এ ঘটনা আরো কয়েকবার ঘটেছিল। কিন্তু কোনোবারই কোনো ভালোবাসা ছিল না। ছিল শুধু আদিম ইচ্ছা পূরণ।

কিছুদিন পরই তার বিয়ে হয়ে যায়। অনেক দিন তাকে দেখি না। জানি না আমাকে তার মনে আছে কি না। এখন আমি আর কোনো মেয়েকেই ভালোবাসতে পারি না। কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকালে নিজেকে বড্ড ছোট মনে হয়।

নিজের থেকে বয়সে বড় কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে দেহ দিয়ে তার শোধ দিতে হয় – এখন এ কথাটিই সব সময় আমার মনে হয়।

*চট্টগ্রাম থেকে*

astroshahin@yahoo.com

## টেস্টোস্টেরনের প্রভাব

– মোহাম্মদ আবছার উদ্দিন ফরায়েজী

গত বছরের যায়যায়দিনের *ফাল্গুনে ভালোবাসা* সংখ্যায় আমার একটি লেখা ছাপানো হয়েছিল *রসায়ন* শিরোনামে। সেখানে লিখেছিলাম, *প্রেম হলো নারীর আন্তঃমনো এবং আন্তঃযৌনতার এক সহজাত প্রকাশ ও বিকাশ। এটা মূলত ইস্ট্রোজেন ও টেসটোস্টেরন নামের দুটি হরমোনের ফসল।* পুরুষের যৌন হরমোনের নাম টেসটোস্টেরন আর নারীর যৌন হরমোনের নাম ইস্ট্রোজেন। এই টেসটোস্টেরন যে আমার জীবনে এতো বড় প্রভাব রাখবে তা কখনো কল্পনাই করিনি।

কৈশোরে প্রায়ই রেডিওতে নাটক শুনতাম। এক ঘণ্টার ওই নাটকগুলো ছিল ভীষণ জীবন ঘনিষ্ঠ ও শিল্পোত্তীর্ণ। এই নাটকগুলোর বেশির ভাগেরই উপজীব্য বিষয় হলো বিরহ। নায়ক-নায়িকার কি ভীষণ প্রেম। সব কিছু ঠিকঠাক। কিন্তু মিলন হতে হতে ভেঙে যেতো। এর পর সারা জীবনভর হতাশা বিষণ্নতা, প্রেম বিহীন জীবন। ওই সব নাটকগুলোই কৈশোরে প্রেম সম্বন্ধে আমার নেতিবাচক ধারনা তৈরি করেছিল। আমি সব সময়

আল্লাহর কাছে বলতাম, আমার জীবনে কোনোদিন যাতে বিয়ের আগে প্রেম না আসে। প্রেম করবো বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে।

এ সংকল্প নিয়েই কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখলাম। ইতিমধ্যে আমার দুই ভাই প্রেম করে বিয়ে করলেন। এদের বিয়ে এখনো টিকে আছে। কিন্তু আমি জানি এরা দুজনেই কতো অসুখী, অন্তর-বাইরে কতোখানি পরাজিত। শুধু স্ত্রীদের কারণে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিকাশ বাধাগ্রস্ত। এদের পরিণতি দেখে আমার সংকল্প আরো দৃঢ় থেকে দৃঢ় হতে লাগলো।

আত্মীয়-স্বজন, বাবা-মা সবারই একই আশা ছিল আমি অন্তত তাদের মতো ভুল করবো না। আর আমিও খুব একটা সুদর্শন না থাকার জন্যে আমার প্রেমে পড়াটাও সহজ ছিল না। এম.এ পড়াকালে পারিবারিক কারণে ব্যবসায় নামতে হলো অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ব্যবসা হলো কমপিউটার ট্রেনিং, সেলস অ্যান্ড সার্ভিসিং। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও একজন দুজন করে আসতে লাগলো কমপিউটার শেখার জন্য। তাদের সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো রকমের সম্পর্কের কথা ভাবার প্রয়োজনই কখনো মনে করিনি।

একদিন আমাদের পরিচিত গণ্ডির মধ্যে একটা মেয়ে কমপিউটার শিখতে এলো। আমার বড় ভাইয়া ও ছোট ভাইয়ার দোকানের পাশেই তার ভাইদের দোকান আছে। প্রথম দিন থেকেই সে আমার সঙ্গে বেশ ফ্রভাবে কথা বলতে লাগলো।

আমি তার সঙ্গে বেশ ফ্র ছিলাম। এর একটা কারণ অবশ্য ছিল মেয়েটি পূর্ব পরিচিত। যদিও এর আগে কোনো দিন কথা বলতাম না। দিন যতোই যেতে লাগলো, মেয়েটা ততোই আমার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা শুরু করলো।

এর আগে আমাকে কোনো মেয়েই প্রেম নিবেদন করেনি। আমিও কাউকে প্রেম নিবেদন করিনি। দুই একজনকে খুব ভালোলাগলেও প্রকাশ থেকে বিরত ছিলাম।

এইচএসসি-তে পড়ার সময় আমাদের ক্লাসের একটা মেয়েকে ভীষণ ভালো লেগেছিল। কিন্তু কোনো ইতিবাচক পরিনতির সম্ভাবনা না দেখে ভালোলাগাটা প্রকাশ থেকে বিরত থাকাকেই শ্রেয় মনে করে বিরত থাকলাম। সে এখন বিবাহিতা, লোকমুখে শুনেছি সে নাকি ভীষণ সুখে(?) আছে।

ফেনী কলেজে ডিগ্রি পড়ার সময় একটা হিন্দু মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। সেও ছিল আমাদের ক্লাসমেট। যখন বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্কটা প্রেমের দিকে গড়াতে লাগলো ঠিক তখনই সে আমাকে থামিয়ে দিল। আমিও সহজে তা মেনে নিলাম। সে এখনো অবিবাহিত, একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা। আমার সঙ্গে এখনো মাঝে মধ্যে দেখা হয়। উপযুক্ত পাত্রের আশায় বসে আছে। হয়তো একদিন দেখা যাবে, উপযুক্ত পাত্রের আশায় বসে থাকতে থাকতে স্থানীয় স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হয়ে গেছে। যাহোক। আসল প্রসঙ্গে আসি, আমি চাচ্ছিলাম সে আমাকে প্রেম নিবেদন করুক। কিন্তু তাকে গ্রহণ করবো না।

এক পর্যায়ে সে আমাকে প্রেম নিবেদন করলো। এদিকে তার কোর্সও শেষ। শেষ দিন আমাকে বললো, আপনাকে আমার সঙ্গে একটু বাইরে যেতে হবে।

তার সাথে বাহিরে গেলাম। দেখলাম সে একটা মেলামাইনের দোকানে ঢুকলো এবং একটা মেলামাইনের মগ কিনলো। মগটা কিনেই সে আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা আপনার জন্য আমার গিফট, স্মৃতি স্বরূপ রেখে দেবেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার জোরাজুরিতে নিতে হলো। এরপর সে বায়না ধরলো তার সঙ্গে একই রিকশায় করে তাদের বাসা চিনে আসার জন্য।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একই রিকশায় উঠলাম। তাকে তার বাসায় নামিয়ে দিয়ে আবার চলে এলাম।

রিকশা থেকে নামার সময় সে আমাকে বললো, যদি কোনোদিন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি আমি যেন তার তালতো ভাইয়ের মাধ্যমে খবর দিই।

এরপর বহুদিন কোনো যোগাযোগ নেই। প্রায় পাচ ছয় মাস পর একদিন দোকানে এসে আমাকে বললো, আপনি আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসেন, আপনার সঙ্গে শুধু দশ মিনিট কথা বলবো।

তার সঙ্গে বাইরে গেলাম।

সে বললো, দেখেন আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আপনি আপনার শেষ কথা বলেন।

সেদিনও তাকে না করে দিলাম।

এরপর বহুদিন আর কোনো যোগাযোগ নেই। পথের মধ্যে দেখা হলে শুধু জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন? আমিও ভালো বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে কেটে পড়ি।

আমাদের এই ব্যাপারটা বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই জানতো। এদের মধ্যে দুই ভাগ ছিল। এক পক্ষ চাইতো প্রেম হোক, বিয়ে হোক। আরেক পক্ষ চাইতো বিয়ে তো দূরের কথা, কোনো সম্পর্কই না হোক। যারা চাইতো সম্পর্ক হোক তাদের সংখ্যা মাত্র দুজন আর অন্য সবাই চাইতো সম্পর্ক না হোক।

আমাকে ওই দুজন একদিন অনুরোধ করলো, আমি যেন তার ব্যাপারটা আবার ভালো করে বিবেচনা করে দেখি।

আমার যে কি হলো! হঠাৎ করে তাদেরকে বলে ফেললাম, তার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলবো। তাকে খবর দিলাম যে, তার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

সে আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে ফেনী কলেজে আসার জন্য বললো।

আমি ফেনী কলেজে গেলাম। সেখানে কথা বলা নিরাপদ নয় ভেবে আলাদা রিকশায় করে আমার এক বন্ধুর দোকানে গেলাম। সেখানে দোকান থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো যে, আমার বাবা-মা যদি তাকে পছন্দ করে তাহলেই কেবল এ বিয়ে হতে পারে। তাও এক বছর পর। তারা পছন্দ না করলে হবে না। কোনো প্রেম-ট্রেম নয়, এ এক বছর আমরা যোগাযোগ রাখবো।

এরপর শুরু হলো আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিকশায় করে ঘোরা। এক সময় ইচ্ছা করে আমার ফ্যামিলিকে জানিয়ে দিলাম।

ফ্যামিলির সবাই এক বাক্যে না করে দিল। মা ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করলেন। বাবা রাগে একদম কথা বলা বন্ধ করে দিলেন।

হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, বাবা-মা রাজি না থাকলেও তাকে বিয়ে করবোই। দুই ভাইয়ের প্রেমের পরিণতি, আমার কৈশোর, যৌবনের প্রতিজ্ঞা, বাবা-মায়ের প্রত্যাশা সব কিছু ভুলে গিয়ে কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলাম তা আজও জানি না।

এরপর অনেক ঘটনা, রটনা। তার পরিবারে আরো খারাপ অবস্থা। আমাকে বিয়ে করলে তার তিন ভাই এক সঙ্গে বিষ পান করে মরে যাবে। প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিটে, ঘণ্টায় কতো ঘটনা ঘটলো তার সব কিছু লিখতে গেলে কয়েক হাজার পৃষ্ঠা লাগবে।

এই কয়েক মাস নিজেকে ভেঙেচুরে দেখার সৌভাগ্য হলো। কতো অজানা অনুভূতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হলো। নিজেকে জানলাম, চিনলাম। আমার চেতন মনের বাইরে অবচেতন মনে যে আরেক আমি-র বসবাস তার সঙ্গে পরিচয় হলো, দেখা হলো, কথা হলো। জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাড়িয়ে দেখেছি জীবন কাকে বলে? জীবনে যে অভিজ্ঞতা হলো তা আমৃত্যু মনে থাকবে।

যখন মনে হচ্ছিল এ বিয়ে যখন হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই ঠিক তখন দুপক্ষের প্রধান কর্তারা রাজি হয়ে গেলেন। মুখে রাজি হয়ে গেলেও মনে ভীষণ মনঃকষ্ট দুই পরিবারেই। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও অনেকের বাধা, ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। বিয়ে হওয়ার এক সেকেন্ড আগেও বিয়ে হবে এ নিশ্চয়তা ছিল না।
এক বর্ষণ মুখর দিনে বিয়ে হয়ে গেল। বাইরে আকাশ অঝোরে কাদছে, আমার অন্তরও অঝোরে কাদছে। নিজের প্রতিজ্ঞা, পিতা–মাতার স্বপ্ন, অনেকের বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হলো। আর বিয়ে করতে হলো অনেকটা শারীরিক, মানসিক, আর্থিক অপূর্ণতা নিয়ে।

*ফেনী থেকে*

# তিন রকম

– জে ভূইয়া

একটা মানুষের জীবনে কতো ঘটনাই ঘটে। সবটাই মনে পড়ে? না, পড়ে না। তবুও যতোটুকু মনে পড়ে ততোটুকুই নিয়ে লিখছি।

**ঘটনা : এক**

পড়ালেখা করছি ঢাকা শহরে। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। স্কুল বন্ধের কারণে বাড়িতে গিয়েছি বেড়াতে। ওই দিন রাতে শোয়ার আগে আম্মা বললেন, তোর মেজভাবী ঘরে একা তোকে আজ ওই ঘরে ঘুমাতে হবে।
উল্লেখ্য যে, আমার ভাবী একা ঘরে তার এক দূর সম্পর্কের বোনকে নিয়ে থাকতেন এবং আমার ভাই দীর্ঘ দিন ধরে প্রবাসে আছেন।
যাক, আম্মার কথা মতো ভাবীর ঘরে ঘুমাতে গেলাম। গভীর রাতে নিজের শরীরের ওপর ভারী, অথচ নরম কিছু একটার চাপ অনুভব করতেই জেগে উঠে দেখি আমারই শরীরের উপর ভাবী শুয়ে আছেন। একটু জোরেই বললাম, ভাবী, এতো রাতে আপনি এখানে?
উত্তরে ভাবী এক হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে বললেন, চুপ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।
বললাম, কি বলবেন বলুন।
ভাবী আমার লেখাপড়ার কথা, স্কুলের মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন কিভাবে বাসার কাজের মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।
লজ্জা পেয়ে ভাবীকে বললাম, আমাকে এসব কথা বলার কারণ কি?
ভাবী আমার নাক চেপে ধরে বললেন, বোকা কোথাকার। রাতে ভয়ে পেলে কিংবা ঘুম না এলে আমাকে ডাক দিও।
পরে অবশ্য ডাক দেয়া হয়নি। কারণ, ভাবীর ছোট বোন পরের দিনই ভাবীর গৃহসঙ্গিনী হওয়ায় আমাকে আর ওই ঘরে ঘুমাতে হয়নি।

**ঘটনা : দুই**

এসএসসি পরীক্ষার পরে দীর্ঘ ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসায় পাড়ার দূর সম্পর্কের এক ভাই বললেন তার ক্লাস ফোর–এর মেয়েকে পড়ানোর জন্য।
যথেষ্ট মেধাবী হওয়াতে *কুছ পরোয়া নেহি* ভেবে নেমে পড়লাম জীবনের প্রথম টিউশনিতে। জীবনের প্রথম টিউশনি এবং মাস শেষে একশ টাকার পাচটি কড়কড়ে নোট পেতাম বলে ভালোই চলছিল আমার দিনগুলো।

কিন্তু গুরুতর বিপত্তি ঘটলো অন্য একদিনে। আগের দিনের পড়া না পারায় দুই আঙুলে তার গাল টেনে ধরতেই এক ঝটকায় আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, এই অভ্যাস কতো দিনের?
বললাম, তোমার গাল ধরেছি তো কি হয়েছে? আমি তোমার কাকা না?
উত্তরে ছাত্রী বললো, আরে রাখেন কাকা। এ রকম কাকাদের আমি চিনি।
পরের দিনই টিউশনিতে ইস্তফা দিই।

**ঘটনা : তিন**

পরিচিত এক লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আনুমানিক রাত নয়টায় মোহাম্মদপুর সংলগ্ন আসাদ গেটে যাই। রিকশা থেকে নামতেই দেখি একটা মেয়ে ঠোটে শস্তা লিপস্টিক এবং মুখ ভর্তি পান নিয়ে কোমর দুলিয়ে হেটে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখে নিশ্চিত হলাম যে, এই মেয়ে বারবনিতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।
প্রস্তাব দিলাম, শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।
মেয়েটি বললো, চলুন, সামনে গিয়ে কথা বলবো।
এই বলে সে আমাকে আলো-আধারির মধ্যে এক গাছের নিচে এনে দাড় করালো।
এইচআইভি প্লাসের ভয়ে এবং নিরোধক না থাকায় সিদ্ধান্ত নিলাম তার সঙ্গে ঘণ্টা হিসেবে গল্প করবো। তারপর মেয়েটির সঙ্গে দুই ঘণ্টা সময়ের বিপরীতে তিনশ টাকা দেয়ার চুক্তি করলাম। তাকে আমি এই কথা, ওই কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম এ লাইনে কতো দিন!
কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, আমার মতো এই নব্য ভ্রমরের শুকনো কথা তার ভালো লাগছে না। তারপরও গল্প চালিয়ে যাচ্ছি। কারণ, তিনশ টাকার মায়া।
এক পর্যায়ে সে বললো, আপনি বসেন, আমি আসছি।
এরপরেই একটা মাস্তু মার্কা ছেলে এসে চাকু দেখিয়ে আমার মানিব্যাগ ও ঘড়ি তার নিজের পকেটে চালান করলো।
তারপরে মেয়েটি এসে ছেলেটির পাশে জড়ো হলো।
তাদের কথাবার্তা শোনার জন্য প্রসাব করার ছলে বসে পড়তেই শুনি, লিটনভাই, এই সুন্দর ঘড়িটা আপনাকে আমি গিফট করলাম।
উত্তরে ছেলেটি বললো, তাতো বুঝলাম। কিন্তু আমাকে দুইশ টাকা দিতে হবে।
সে মেয়েটির কাধে হাত রেখে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

*রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে*

## ভেজাল

– নিজাম

খালেদভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টা হঠাৎ করেই। চট্টগ্রামেরই সহজ-সরল আটাশ পার হওয়া যুবক। আমি তার থেকে বছর আটেকের ছোট। পরিচয়টা আমাদের স্বদেশে নয়, বিদেশে ইনডিয়ার মাদ্রাজে। প্রথম পরিচয়ের অল্প দিনের আমাদের সম্পর্কটা কিছুটা ভাইয়ের মতো, কিছুটা বন্ধুর মতো জমে ওঠে। পুরো ব্যাপারটা বোঝার জন্য কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা দরকার।
২০০০ সালের প্রথম দিকে আমার অসুস্থ পিতাকে নিয়ে ইনডিয়ার মাদ্রাজ গমন। অপারেশনের সিরিয়াল পেয়েছি দুই মাস পর। আপাতত হাতে কোনো কাজ নেই। এই সময়টা কাটে আমার পরোপকার করে,

বাংলাদেশ থেকে আসা বিভিন্ন রোগীদের সাহায্য–সহযোগিতা করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভেল্লোর–এর সিএমসি হাসপাতালের রোগীদের এক বিশাল অংশ বাংলাদেশি।

এক সন্ধ্যায় হাসপাতালের বিপরীত পাশে বাবুরাও স্ট্রিটে খালেদভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম পরিচয়ে তিনি যা জানালেন তার সারমর্ম এই – তিনি চিকিৎসার জন্য তার সঙ্গে এক পরিচিত লোককে নিয়ে এসেছিলেন যিনি সিএমসি হাসপাতালে বেশ কয়েকবার এসেছেন। এখন সেই লোকটি হঠাৎ করে চলে যাওয়াতে তিনি বেশ অসুবিধায় পড়ে গেছেন। কারণ তামিল দুর্বোধ্য ভাষা। আর হিন্দি বা ইংরেজি কোনোটাতেই তিনি কাজ চালানোর মতো দক্ষ নন।

আমি কেমন যেন এক ধরনের টান অনুভব করলাম। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তিনি আর আমি চট্টগ্রামে প্রায় কাছাকাছি জায়গাতেই থাকি। খালেদভাইকে আশ্বস্ত করলাম, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি আছি।

এরপর থেকে আমার রুটিন ওয়ার্ক হলো খালেদভাইকে সব কাজে সাহায্য করা, ডাক্তার আর ওনার মাঝে দোভাষী হিসেবে কাজ করা, অবসরে আড্ডা। আস্তে আস্তে আমার আব্বার অপারেশন তারিখ ঘনিয়ে এলো। খালেদভাইয়ের চিকিৎসা প্রায় শেষ পর্যায়ে। দুজন মিলে ঠিক করলাম, আমার আব্বার অপারেশন সময়ে তিনি আগ্রা, আজমির বেড়িয়ে আসবেন। পরে আব্বা সুস্থ হলে দুজনে মিলে দেশে যাওয়া যাবে। প্ল্যান অনুযায়ী পরদিনই আজমিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আমার মতো আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। দুই দিন পর খালেদভাইয়ের ফোন। গলার আওয়াজে মনে হলো বেশ খুশি। খুশি হওয়ার মতোই ঘটনা বটে। তিনি একজন মা এবং বোন পেয়েছেন।

বলাই হয়নি খালেদভাই খুব ছোটবেলায় মা হারিয়েছেন। বরাবরই নানির কাছে থেকে মানুষ। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি, খালেদভাই কিছুটা স্নেহের কাঙাল। কেউ ভালো করে দুই চার কথা বললেই তিনি গলে যান। যাহোক, মূল ঘটনায় আসি। আজমিরে ঢাকার এক মহিলার সঙ্গে পরিচয়। সঙ্গে ব্যাঙ্গালোর কমপিউটার সায়েন্সে পড়ুয়া তরুণী কন্যা। খালেদভাই তাদের সঙ্গে মা আর বোনের সম্পর্ক পাতিয়েছেন। আপাতত ফোনে এটুকু জানালেন।

সপ্তাহ খানেক পর খালেদ ভাই জানালেন তার নতুন মা এবং বোনের সঙ্গে তিনি ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছেন। কারণ তার পাতানো বোন ব্যাঙ্গালোরে সম্প্রতি পড়াশোনা শেষ করেছে। সেখান থেকে তলিতল্পা গুটিয়ে দেশে চলে যাবে। খালেদভাইও তাদের সঙ্গে ফিরবেন।

পুরো ব্যাপারটাই আমার একটু অস্বাভাবিক লাগছিল। তারপরও ভাবলাম যাক অন্তত খালেদভাই লোনলি ফিল করছেন না।

আরো সপ্তাহ দুয়েক পরের ঘটনা। মাদ্রাজ স্টেশন হতে ট্রেনে উঠেছি। ট্রেন ছাড়তে আরো প্রায় আধঘণ্টা দেরি। আব্বা আম্মাকে সিটে বসিয়ে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছি। হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে খালেদভাই দাঁড়িয়ে। জানালেন যে, এ কয়েকদিন মাদ্রাজের আনাচে–কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই মা বোনের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে একই ট্রেনে সেই মা বোনকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হচ্ছেন।

খুশি হলাম দীর্ঘ পথ খালেদভাইয়ের সঙ্গ পাওয়া যাবে বলে।

ট্রেন চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সেই মা এবং বোনের সঙ্গে আমার আব্বাও আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম পয়তাল্লিশ পার হওয়া মহিলা এবং সঙ্গে তার যুবতী কন্যা। ট্রেন চলার পর থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে লাগলাম। তার সেই পাতানো বোনটি কিছুক্ষণ পর পর কিছু খাওয়ার আবদার করছে আর খালেদভাই সোৎসাহে কিনে দিচ্ছেন। আমার একটু বিরক্ত লাগলো। পরে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলাম,

আহা! নিজাম তোমাকে তো খালেদভাই কম খাওয়াননি। এখন তার বোনকে খাওয়াচ্ছে তোমার এতো গাত্রদাহ কেন?

অবশেষে ট্রেন কলকাতা পৌছালো। সবাই একই হোটেলে উঠলাম। ভাত খেতে গিয়ে খালেদভাই মা, মেয়ের বিল দিচ্ছেন। আবার খটকা! ভাবলাম, ধ্যাৎ, ছেলে হিসেবে মায়ের বিল দেবে না তো কার দেবে?

দুই দিন পর হোটেল ছাড়ার সময় তাদের বিলও খালেদভাইকে দিতে হলো। এবার খালেদভাই উশখুশ করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে জানালেন, এটা কেমন বিচার হলো! মা ডেকেছি বলে কি সব ব্যয় আমাকেই বহন করতে হবে?

মুচকি হেসে বললাম, আদর্শ পুত্রেরই কাজ করেছেন।

মূল ঘটনা বলা হয়নি। মা মেয়ে হোটেল ছেড়ে যাবার আগে একটি বিশাল বস্তা দেখিয়ে বললেন, খালেদভাই এটি যেন তার সঙ্গে নিয়ে যান। ঢাকায় তাদের বাসার ঠিকানায় পৌছে দেন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম। কারণ খালেদভাইয়ের অবস্থা আমরা জানি। মেরুদণ্ডের রোগের জন্য খালেদভাই চিকিৎসা করাতে এসেছেন। কোনো ভারী জিনিস ওঠানো বারণ।

আমাদের প্রতিবাদের মুখে মা মেয়ে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। বললো, তাদের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে খালেদের।

খালেদভাই লজ্জায় কিছুই বলতে পারছিলেন না। অবশেষে সেদিনের বিকেলের ফ্লাইটে মা মেয়ে কলকাতা ছাড়লো। খালেদভাইও শেষ পর্যন্ত সে বস্তাটি পৌছে দিয়েছিলেন। বস্তায় ছিল ব্যাঙ্গালোর পড়ুয়া মেয়ের হাড়ি, পাতিল, কাপড়–চোপড়, কম্বলসহ পুরনো জিনিসপত্র।

এরপর খালেদভাই যা জানালেন তা আরো ভয়াবহ। মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ভ্রমণে মা মেয়ের পুরো খরচই খালেদভাইকে বহন করতে হয়েছে। দেশে যাওয়ার টাকা নেই, আমি যেন কিছু টাকা ধার দিই।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হলাম।

কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামে খালেদভাইয়ের বাসায় ফোন করে জানতে পারলাম, সেই মা মেয়ে দেশে আসার পর আর কোনো যোগাযোগই করেনি।

সেই মা মেয়েকে আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, মা বোনের ভালোবাসা দিয়ে কেন একজন সরল যুবককে তারা প্রতারিত করলো?

আমি ভাবি, এই ভেজালের দেশে কোনো ভালোবাসাই কি খাটি নেই?

*চট্টগ্রাম থেকে*

## শুধু বলা হলো না

– হানিফ

অবশেষে তার সঙ্গে আমার কথা হলো। বুকের ভেতর বসেছিল যে দীর্ঘ দিন শব্দহীন সেই স্বর আঠারো বছর পর উচ্চারিত হলো। কণ্ঠস্বরে কোনো পরিবর্তন নেই। সেই আগের হাসি, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠস্বর। কি চমৎকার! মনে হচ্ছিল যেন তার মুখোমুখি বসে কথা বলছি। অদ্ভুত এক ভালোলাগায় মনটা ভরে গেল।

শাওন ছিল আমার সহপাঠী। দীর্ঘ আঠারো বছর তার সঙ্গে আমার কথা নেই, দেখা নেই। সে এ দেশেই থাকে। দুই সন্তানের জননী। স্বামী ও সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। শাওন ছিল আমার স্বপ্নের এক মায়াবী অস্তিত্ব। শাওনের মতো একটি মানবীর চিত্র প্রায় সময়ই মনে মনে আকতাম আর বাস্তবে সেই ছবিটি খুজতাম। একদিন বাস্তবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ক্লাসের প্রথম দিন। ক্লাসে ঢুকে প্রথমে তার মুখোমুখি হলাম। সেই মায়াবী চোখ, টান টান বুক, অসম্ভব সুন্দর একটি মুখ। কিছুক্ষণ তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলাম। তাকে মনের মধ্যে একে নিলাম। সে ছিল আমার ব্যাচের, একটু ভালো ছাত্রী এবং ভীষণ পড়ুয়া। মাঝে মধ্যে তার নোট, বইপত্র এসবের সহায়তা পেতাম।

মনে মনে তার সঙ্গে আমার একটা তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল, তাকে যেন হারাতে পারি। তাকে নিয়ে কবিতা লিখতাম, গল্প লিখতাম। দিন-রাত তার সঙ্গে গল্প করতে চাইতাম। সে ছিল বুদ্ধিমতী। তাই আমার এসব ছেলেমানুষিকে সে প্রশ্রয় দিতো না। কিন্তু আমাকে সে কোনোভাবে আঘাতও করতো না।

তার প্রতি ছিল আমার এক অদ্ভুত রকমের টান। কারণ, তাকে সারা জীবনের জন্য পেতে চাইনি। তার শরীরকে কোনোদিন স্পর্শ করতে চাইনি। অথচ তাকে না দেখলে আমার মনে একটা কষ্টের জন্ম হতো। খারাপ লাগতো। মনটা কেমন কেমন করতো। শাওন কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখালে আমার ভীষণ রাগ হতো। এমনি করেই কাটছিল আমাদের দিনগুলো।

দীর্ঘ পাচ বছর। একদিন হঠাৎ করেই শাওনের বিয়ে গেল। খুব দুঃখ পেলাম। এখন শাওন এক অন্য মানুষ। চমৎকার সব ড্রেস। মুখে একটা আনন্দের ঝিলিক যেন এর প্রত্যাশায়ই সে ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা পাস করে ফেললাম। তারপর যার যার কর্মক্ষেত্রে চলে গেলাম। নিজের কাজ করি। মাঝে মধ্যে শাওনের কথা মনে পড়ে।

শাওন ছিল খুব একটা ভালো মেয়ে। আমাকে সে অনেক সাহায্য করেছে। তার কাছে আমি খুবই ঋণী। অথচ আমার কৃতজ্ঞতা জানার কোনো সুযোগ নেই।

কিছুদিন আগে সে ডা. মোস্তারি-র বাসায় এসেছিল। কয়েকদিন পর মোস্তারির বাসায় গেলাম। শাওনের খবর নিলাম। কিন্তু আমার ব্যাপারে শাওন কোনো আগ্রহ দেখায়নি এ কথা জানার পর মনটা একদম দমে গেল। মোস্তারির কাছ থেকে শাওনের ফোন নিলাম। তাকে ফোন করতে চাইলাম।

মোস্তারি আমাকে বারণ করলো। কারণ, শাওন এতে বিরক্ত হতে পারে।

একটা অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম। যে আমার সহপাঠী ছিল দীর্ঘ পাচ বছর, যার সঙ্গে কাটিয়েছি দীর্ঘ সময়, যে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে, যে ছিল আমার প্রেরণার উৎস, যার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সেই তার সঙ্গে কথাও বলতে পারবো না। কি অদ্ভুত নিয়ম! কি অপরাধ আমার?

এমনি করেই কেটে গেল দুই বছর।

এবার শাওন ঢাকায় এসেছে খবর পেলাম। নিঃসংকোচে তাকে ফোন করলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হলো। মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। অনেক কথা হলো।

শুধু একটি কথা তাকে বলা হলো না। তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছা করে।

*বগুড়া থেকে*

## অবুঝ মেয়ে

– টিয়ার্স

একা থাকতে আমার খুব ভালোলাগে।

বিকেলে ছাদের ওপর একাকীত্ব উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ পাশের রাস্তায় চোখ পড়তেই রিভাকে দেখতে পেলাম। হ্যা, সেদিনই প্রথম রিভাকে দেখি। সময়টা ছিল ২০০৩ সালের মার্চ।

এরপর প্রতিদিন স্কুলের যাবার সময় দেখতাম। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কারণে তাকে দেবার মতো সময়ই পেলাম না। পরীক্ষা শেষ। একদম ফ্রি। তাকে খুব সুইট লাগছিল। ওই দিন দুর্গাপূজার সময় পূজামণ্ডপ দেখতে যাই। সেখানে রিভাকে পাই। সঙ্গে তার বড় বোন...।

দিন যেতে লাগলো। প্রতিদিন আমার বাসার সামনে দিয়ে স্কুলে যায়। কিন্তু বড় বোন সঙ্গে থাকার কারণে কথা বলা সম্ভব হয় না।

ঈদের বন্ধ যেদিন দেয়া হলো সেদিন রিভাকে একা পেলাম। একটি চিঠি দিলাম। খুব স্বাভাবিকভাবেই সে চিঠিটি নিল। ওই চিঠিতে সব কিছু না লিখে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলাম। কিন্তু স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার কারণে রিভাকে আর পেলাম না। তার বাসা চিনতাম। তবে সেখানে আমার পরিচিত মানুষ থাকায় যাইনি।

ঈদের পর স্কুল খুলেই বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার মধ্যে রিভার সাথে ওই বিষয়ে কথা বললে হয়তো পড়ালেখার ক্ষতি হবে এই ভেবে কিছু বললাম না। পরীক্ষা শেষ হলো ১৫ ডিসেম্বর।

রিভা বাসায় ফেরার পথে এক রকম জোর করেই তার সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, ভালোবাসা কি অপরাধ? সে বললো, হ্যা। আমার কাছে ভালোবাসা অপরাধ।

আরও কিছু কথা শেষে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় এলাম। কোনো কিছু ভাবার আগেই রিভার মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। জানলাম রিভা বাসায় সব বলে দিয়েছে এবং খাওয়া বন্ধ করে কাদছে। রিভার মা আমাকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বোঝালেন।

ওই সময়ে আমার সরি বলা ছাড়া আর...।

কিন্তু রিভাকে ভুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। দীর্ঘ নয় মাসে হৃদয়ে জমানো ভালোবাসার কথা প্রকাশ করার দশ মিনিট পরই ভালোবাসার মানুষটিকে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব?

জানি না অবুঝ মেয়ে কেন এমন করলো?

আমি মুসলমান ছেলে হয়ে কৃশ্চিয়ান মেয়েকে ভালোবাসতে চেয়েছি এটাই কি আমার অপরাধ?

*গুলশান, ঢাকা থেকে*

## স্বপ্নের মতো

– এস.আই. অফ পুলিশ

অক্টোবরে রাত নয়টায় নন্দন কানন চট্টগ্রামে একটি পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম। ওই মণ্ডপের পূজারির দুই ব্রাহ্মণ ছেলে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সুবাদে তাদের নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনুষ্ঠানে রাত অনুমান সাড়ে নয়টায় একটি মেয়ে এলো। বব কাটিং চুল, কাধে ব্যাগ, হাতে মোবাইল। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে সেও অনুষ্ঠানে নাচ শুরু করলো। তা দেখে অন্য ছেলেদের নাচ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সবাই তখন ওই মেয়েটিকে দেখছিলাম। সত্যি কথা বলতে, মেয়েটিকে এবং তার নাচ দেখে আমারও প্রচণ্ড ভালো লেগেছিল। তার নৃত্য চলাকালে পূজা মণ্ডপে আগত লোকজনদের দিকে নজর রাখছিলাম। পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত চারজন পুলিশই আমাকে চেনে। কারণ, আগে তাদের সঙ্গে আমি ডিউটি করেছি।

একদিকে মেয়েটির নৃত্য চলছে, অন্যদিকে জটলা ধীরে ধীরে বাড়ছে। একজন কনস্টেবলকে বললাম, আপনি এলার্ট থাকবেন, যে কোনো সময় একটা সিন কৃয়েট হতে পারে।

আমি পুলিশের একজন নতুন অফিসার। আমার ট্রেনিং শেষ হয়েছে সবেমাত্র দেড় বছর।

যাই হোক। এক সময় আমি সংবাদ পেলাম, মণ্ডপে আগন্তুকদের মাঝে দুই তিনজন ছেলে ফলো করছে মেয়েটিকে। নাচ শেষে মেয়েটি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তার পেছন পেছন বেরিয়ে এসে বললাম, এক্সকিউজ মি, আপনি কি একা।

সে বললো, হ্যা, কিন্তু কেন?

বললাম, বোধহয় দুই তিনজন ছেলে আপনাকে ফলো করছে।

কিছুটা ভীত হয়ে জানালো যে, সে ক্যান্টনমেন্টে থাকে, একা পূজা মণ্ডপ দেখতে বেরিয়েছে।

বললাম, Can I help you? আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?

সে বললো Sure. শিওর।

সে রিকশা ঠিক করলো ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত। রিকশায় বসে আলাপে তার পরিবার সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমি ও আমার সম্পর্কে তাকে তথ্য দিলাম। আলাপকালে আমরা আপনি থেকে তুমিতে চলে গেলাম। তারপর তার কথা আর কি শুনবো, আমার কথা বলতে এতোই ব্যাকুল ছিলাম যে, আমি যে তেলাপোকাকে ভয় পাই এবং আমার কাতুকুতু খুব বেশি সে কথা পর্যন্ত তাকে বলে দিয়েছি। কারণ, পুরো পরিস্থিতিটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

রিকশা যখন পাচলাইশ থানা এলাকা পার হলো তখন সে রিকশার হুড উঠিয়ে দিয়ে বললো, এখন আমি যা কিছু করবো, তুমি কোনো কথা বলবে না, একদম চুপ। এই বলে আমার চিবুকে হাত দিয়ে দুটি ঠোট সম্পূর্ণ তার মুখের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে দলতে লাগলো তাতে আমার সারা শরীর কেমন যে করতে লাগলো সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। এভাবে চলতে চলতে রিকশা কখন যে ক্যান্টনমেন্টে চলে এসেছে তা আমার খেয়াল নেই।

এমপি চেক পোস্ট বক্সের কাছে আসতেই সে বললো, এই রিকশা। ঘোরাও আজ আমি বাসায় যাবো না। তোমার সঙ্গে সারা রাত থাকবো।

তার কথা শুনে থ হয়ে গেলাম।

সে রিকশা ঘুরিয়ে চলে এলো সোজা ডিসি হিলে। বললো, চলো ডিসি হিলে বসে আড্ডা দিয়ে রাত পার করে দিই।

রাত প্রায় একটা বাজে। কি করবো বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করছে না আবার ছেড়ে যেতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ সারা রাত এই মেয়ের সঙ্গে ডিসি হিলে বসে কাটিয়ে দেবো। দেখি এর শেষ কোথায়।

মনের ভেতর একদিকে আনন্দ, চাকরির জন্য ভয় আবার টেনশন সব মিলিয়ে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া কাজ করছে। কিছুক্ষণ পর সে বললো, এই, আমার কাছে এসে বসো।

আমি বসলাম।

সে বললো, গায়ের সঙ্গে লেগে বসো।

তার গা ঘেষে বসার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত শিহরণ লাগলো।

এবার সে আমাকে জড়িয়ে ধরে নাক, মুখ, কান, ঠোট, গলা, কপালে সমানে চুমু খেতে লাগলো।

সে যতো বেপরোয়া হতে লাগলো, আমি ঠিক ততো চুপচাপ হয়ে রইলাম।

এক সময় সে বললো, মনে হচ্ছে তুমি খুব চিন্তিত।

বললাম, হ্যা।

সে বললো, কেন?

বললাম, দেখো, তোমাকে হেলপ করার জন্য আমি এগিয়ে এলাম আর তুমি বাসায় না গিয়ে চলে এলে এখানে, এর মানে কি? আমার তো এখন তোমার সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে।

সে বললো, যখন তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকছিলাম তখন সময় রাত বারোটা। তখন তোমাকে নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলে লোকজন আমায় কি ভাবতো আর আমার পরিবারেও সমস্যা হতো। তাই বাসায় যাইনি।

বললাম, তাহলে কাল সকালে গিয়ে কি বলবে?

সে বললো, সেই জবাব আমি দেবো। আজ তো মাত্র তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আস্তে আস্তে আমার সম্পর্কে সব জানতে পারবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমি বুঝলাম মানুষ কতো সহজ-সরল হতে পারে। তোমার সব কথা তুমি আমায় বলেছো। তাই আমিও ভাবলাম, আজ সারা রাত তোমার সঙ্গে থাকবো যা হয় হবে। একটু নীরব থেকে সে বললো, এই, আমি তোমার কোলে শোবো।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। যখন সে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো তখন আমি আলতো করে এক হাত তার বুকে রাখলাম। এক হাত দিয়ে তার চুল, মুখ, গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম এবং আমার মনের সব কথা একে একে তাকে শোনালাম।

সে চুপচাপ শুয়ে রইলো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সে রাতে তাকে মন-প্রাণ উজাড় করে আদর করেছি। কারণ, আমার এই ২৮ বছর জীবনে বাইরের কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রেম করা হয়নি। এরপর তার কোলে শুয়ে পড়লাম। সে আরো বেশি করে আমাকে আদর করতে লাগলো। তখন মনে হয়েছে আমার জন্ম বোধহয় এতোদিনে সার্থক হলো।

এক সময় সে বললো, এই ওঠো।

আমি উঠতেই সে পাকা বেঞ্চে শুয়ে পড়লো এবং বললো, তুমি আমার ওপর উঠে শোও।

মানে?

মানে আবার কি, বললাম না আমার ওপর উঠে শোও।

এতে তোমার কষ্ট হবে, ব্যথা পাবে।

একটুও ব্যথা পাবো না। তুমি শোও। তা না হলে চিৎকার করে লোকজন ডেকে তোমাকে পুলিশে দেবো আর জানাজানি হলে তোমার চাকরি চলে যাবে, আমার কিছুই হবে না।

চাকরি চলে যাবার কথা বলাতে আমার চোখে পানি চলে এলো। কারণ, এ চাকরিটা যে কতো কষ্ট করে পেয়েছি তা আমি জানি। মনে মনে বললাম, আল্লাহ, এ যাত্রায় তুমি আমার চাকরিটা বাচাও, আমি আর জীবনে কোনোদিন যেচে গিয়ে কোনো মেয়ের উপকার করতে যাবো না।

আমার চোখের পানি দেখে সে বললো, কি ব্যাপার, কাদছো কেন?

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তার পা দুটো ধরে বললাম, তুমি যা খুশি করো, তবে একটা অনুরোধ, আমার চাকরিটা চলে যাবে এমন কোনো কাজ তুমি করো না।

সে ঝটকা মেরে তার পা থেকে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আমি তো তোমাকে এমনিতেই ভয় দেখানোর জন্য বললাম।

এবার আমার কান্না আরো বেড়ে গেল।

সে আমাকে জড়িয়ে ধরে পাকা বেঞ্চে শুয়ে পড়লো। কতোক্ষণ তার ওপর শুয়ে ছিলাম জানি না। এই সময়ে সে আমার শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যে হাত দেয়নি। সে অক্টোপাসের মতো আমাকে প্যাচিয়ে ধরে রেখেছিল। আমি শুধু তার হাতের পুতুল হয়েছিলাম।

কিছুক্ষণ পর সে আমাকে বললো, এখন তোমার সঙ্গে আমি সেক্স করবো।

তার এ কথা শুনে আমার মাথা ঝিম দিয়ে উঠলো। একটু নীরব থেকে শান্তভাবে, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তাকে বললাম, এ কাজ তোমার সঙ্গে করতে পারবো না। পারলে আমাকে মেরে ফেলো, তাও করবো না।

আমার দৃঢ়তা দেখে সে আর এগোয়নি।

তারপর সে বললো, সেই প্রথম থেকে তোমাকে আমি আদর করছি, চুমু খাচ্ছি। কিন্তু তোমার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখছি না।

বললাম, সেই রাত দশটা থেকে তোমাকে হেলপ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এসেছি। এবং এখন পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করে আমার ভেতরের সব কিছু বলেছি। আমার ভেতর কোনো ইচ্ছা নেই যার জন্য তোমার সঙ্গে এ ধরনের কোনো কিছু করতে পারছি না।

সে আমাকে অনুরোধ করলো, অন্তত তাকে জড়িয়ে ধরে যেন চুমু খাই।

তার অনুরোধে এমন অসহায় ভাব ছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলাম এবং তার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর সে বললো, এবার ছাড়ো।

আমি ছাড়লাম না।

সে বললো, কি ব্যাপার?

বললাম, ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।

এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। যখন ফজরের আজান দিল তখন ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হয়ে গেল তখন সে রিকশা নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট চলে গেল।

আমি বাসায় চলে এলাম। তার মোবাইল নাম্বারে কল করেছিলাম। কিন্তু পুরুষ লোকের কণ্ঠ শুনে আমার ভেতরে কেমন যেন করে উঠলো। এরপর আর কল দেইনি।

সেই পূজা মণ্ডপে আবার গিয়েছিলাম কালী পূজার অনুষ্ঠান দেখতে। মূল উদ্দেশ্য ছিল, যদি আবার তার দেখা পেয়ে যাই। তার অপেক্ষায় রাত দুইটা পর্যন্ত ছিলাম। কিন্তু সে আর আসেনি।

আমি এখন প্রতিদিন আমার অফিসে যাবার সময় এবং অফিস থেকে আসার সময় ডিসি হিলের ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করি। যে বেঞ্চে আমরা সারাটা রাত কাটিয়েছি সে বেঞ্চের দিকে তাকালে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বেঞ্চটাকে খুব আপন মনে হয়। আমার জীবনের প্রথম প্রেম, স্নেহ, মমতা তাকে উজাড় করে দিয়েছি। সে আসলে কে? আর কোনোদিন তার দেখা পাবো কি না তাও জানি না। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমি তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল।

*চট্টগ্রাম থেকে*

## মতিলালের বৌ

– মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

চেহারায় পাহাড়ি ছাপ। জামা ময়লা। নিজেকে মতিলাল পরিচয় দিয়ে একটা কাজ চায়।

সোজা বলে দিলাম, না। কারণ, বিশ্বাস। দেশের বাইরে থাকা হয় বলে বিশ্বাসটা আরো হালকা।

মা ব্যাপারটায় মাথা দিলেন। মায়ের চোখেও কিছুটা সন্দেহ। তবে মা তাকে ফেরাবেন না জানি। মায়ের সহানুভূতি, আমাদের গাড়িটা ধুয়ে মুছে রাখতে পারবে? দুইশ টাকা পাবে মাসে।

বয়সে তরুণ হলেও বিনয়ী হ্যা সূচক জবাব।

মতিলালের কাজ শুরু আমাদের গাড়ি দিয়ে। এরপর পাশের বাড়ির রুবি আন্টি, ফিরোজ সাহেব। ধীরে ধীরে দুইশ টাকার বেতনে বারো তেরোটা গাড়ি। এরপর মতিলাল কলোনির একজন। সালমাভাবীর বাচ্চাদের স্কুলে নেয়া, কারো বাড়ির টেলিফোন বিল দেয়া, আবার কারো টুকটাক বাজার করা।

আজ মতিলাল ব্যস্ত এমন কথা শুনলে রফিক এতো বড় বাগান নিয়ে বসে পড়বেন। কারণ, মতিলাল জানে কোন গাছটার কি যত্ন করতে হয়।

প্রায় চার বছর পর। একদিন বাড়ি যেতে চায় মতিলাল। এতো কাজের ফাকে কখনো কেউ জানতে চায়নি তার পরিচয়। ছুটির অনুমতিটা মাকেই দিতে হবে। ঠিক পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর।

সময় মতো ফিরে আসার কথা দিয়ে মতিলালের বাড়ি যাওয়া। খাগড়াছড়ির কোনো এক গ্রাম। এরপর এক মাস, এক বছর এবং প্রায় তিন বছর। সবাই মোটামুটি ধরেই নিল, মতিলাল আর ফিরবে না। প্রথম কয়েকমাস মোটামুটি সবাই খবর নিতো। এরপর সব আগের ধারায়।

তিন বছর পর। সন্ধ্যায় দরজার কাছে কাউকে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সহজ-সরল চেহারাটা প্রায়ই পরিচিত। আমতা করে বলতে চাইলাম ম...তি...।

জি স্যার, মতিলাল। স্বাভাবিক উত্তর। পাশের সুন্দর মিষ্টি এক মেয়েকে দেখিয়ে বৌ পরিচয় দিল।

এরপর মতিলালের অনেক কথা। মায়ের কাছেই শুনলাম। কলোনি থেকে যাওয়ার পর তার বৌ মানে হীরার সঙ্গে পরিচয়। বছর দুয়েক প্রেম চলে তাদের। হীরার বাবা টাকার লোভে এক দুষ্টু লোকের কাছে বিক্রি করে দেয় হীরাকে। মতিলাল তার জমানো সব টাকা দিয়ে প্রায় দ্বিগুণ টাকায় হীরাকে ছাড়িয়ে নেয়। বিয়ে করে এখন আবার শহরে আসা চাকরির খোজে, পুলিশের চাকরি।

মা আশ্বাস দিলেন সহায়তার।

খবর ছড়িয়ে পড়লো। সালমাভাবীই প্রথম তার পুরনো কাজ ফিরিয়ে দিলেন। এরপর একে একে সবাই। মতিলালের বৌ বাসার কাজে নিয়োগ পেল।

একদিন সুখবর এলো মতিলালের। কলোনির এক সরকার দলীয় নেতার সহায়তায় পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি। মতি কৃতজ্ঞ। নেতার ওপর ভীষণ কৃতজ্ঞ সে। বছর পার হলো।

অনেক দিন পর মতিলালের বৌ এলো বেড়াতে। কোলে মিষ্টি একটা বাচ্চা।

মা বার বার চেষ্টা করেও বাচ্চাকে মিলাতে পারলেন না। শিশুটার চেহারায় কোথাও একটা অমিল, অপূর্ণতা। তাদের খবর জানতে চাইলেন মা।

উত্তরে মতিলালের বৌ একটু কেদে ফেললো।

বললো, মতিলাল খুব খুশি। নেতার কথায় চাকরি পাইলো। নেতা তারে পুলিশ বানাইলো আর আমারে এই বাচ্চা উপহার দিল।

শিশুটির চেহারার অমিল মা খুজে পেলেন। মতিলালের চাকরি হলো। আর নেতাটি তার বিকৃত ভালোবাসার উপহার রেখে দিল তাদের সুখের সংসারে।

islam35th@yahoo.com

# কাজলী

– মনি

তখন আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র। প্রায় ছয় মাস পর ছুটিতে বাড়ি এলাম। পৌছালাম রাতে। এই ছয় মাসের মধ্যে আমাদের বাড়ি মধুমতি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নতুন বাড়ি হয়েছে পার্শ্ববর্তী গ্রামে।

সকালে ঘুম ভাঙতে নয়টা বেজে গেল। এটা-সেটা করতে করতে এগারোটা হয়ে গেল। গোসল করবো বলে বের হলাম। বাড়িতে টিউবওয়েলের পানি দিয়েই গোসল করে থাকি। গোসল শেষ হতে না হতেই দেখি এক ঝাক মেয়ে। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় বিশজন কলসি কাখে সারিবদ্ধভাবে আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে এবং আমাকে টিউবওয়েলের পাশে দেখে থমকে গেছে। বুঝতে পারলাম এরা এ গ্রামেরই হিন্দু পাড়ার মেয়ে এবং বৌ। আমাদের টিউবওয়েল থেকে পানি নিতে আসছে।

গোসল শেষ করেই আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম। সবাই একে একে কলসিতে পানি ভরে নিয়ে চলে গেল। আমার চোখ আটকে গেল একটা কিশোরীকে দেখে। বয়স ষোল সতেরো বছর। শ্যামবর্ণ চেহারা। সুন্দর স্বাস্থ্য, লম্বা চুল। পরনের কাপড়টি অন্যদের তুলনায় উন্নতমানের। বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে হলো সবার চোখের আড়ালে সেও আমাকে একটুখানি দেখে নিল।

বিকেলে কোথাও যাবো মনে করে বের হতেই দেখি সেই মহিলারা একইভাবে কলসি কাখে নিয়ে আসছে। দূরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। দেখলাম সেও এলো এবং কলসিতে পানি ভরে নিয়ে চলেও গেল। মনে হলো, এবার যেন একটু ভালো করেই আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। একটু যেন হাসলো। গালটা যেন একটু বেশি লাল হলো। এ হাসি আমার মনে এক নতুন রঙ ছড়িয়ে দিল।

আমি সবে কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করেছি। তার এই ভীরু চোখের চাহনি, ঠোটের কোণে ক্ষীণ হাসি, আমায় যেন অন্য জগতে নিয়ে গেল। আজকাল এ অবাধ মেলামেশার দিনের ছেলেমেয়েরা বুঝতেই পারবে না এই সামান্য হাসি, কাপা কাপা চোখের ভীরু চাহনি আমাদের মনে কেমন শিহরণ আনতো।

খোজ নিলাম কে এই কিশোরী। জানতে পারলাম আমার স্কুল জীবনের এক সহপাঠীর ছোট বোন। নাম কাজলী। ভালো নাম হয়তো কাজল লতা বা অন্য কিছু।

এক মাস বাড়িতে ছিলাম। প্রতিদিন সকাল-বিকেল আমাদের চার চোখের মিলন, কিছু মিষ্টি মধুর হাসি এ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। কয়েকদিনের মধ্যেই তার সখীরা জেনে গেল। দেখতাম আমার দিকে তাকিয়ে তারা হাসাহাসি করছে এবং কাজলীকে কিছু বলছে আর সে লজ্জিতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমাদের বাড়ি থেকে তাদের বাড়ির দূরত্ব এক কিলোমিটার। এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি দেখা যায়। কখনো দেখতাম হয়তো বৈঠকখানায় বসে পড়াশোনা করছি আর কাজলী তাদের বাড়িতে এমন এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে যাতে তাকে দেখতে পাই।

এক মাস বাড়িতে ছিলাম একবারও তার সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তবুও একদিন তাকে না দেখতে পেলে মনটা আমার শূন্যতায় ভরে যেতো। রাজশাহী ফিরে এলাম। পড়াশোনায় মন দিলাম। কিন্তু কাজলীকে ভুলতে পারিনি। অহরহ তার কথা মনে হতো। কবে ছুটি হবে, বাড়ি যাবো, কাজলীর দেখা পাবো।

তিন মাস পর। বাড়িতে আবার এলাম। আমার একটাই চিন্তা কখন কাজলীর দেখা পাবো। সকালেই দেখলাম সেই কাফেলা আসছে এবং কাজলীও তাদের মধ্যে আছে। আমার বুকের মধ্যে যেন লক্ষ্য পাখি এক সঙ্গে ডানা ঝাপটালো। চার চোখের মিলন হলো। আমার দেখা পেয়ে সেও খুবই উৎফুল্ল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অহেতুক একজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। অন্য একজনকে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল। অন্য মেয়েরা কানে কানে কি বলতেই ভীষণ লজ্জা পেল। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে দাড়িয়ে থাকলো।

বিকেলে আবার এলো। কপালে টিপ, পরনে বাহারি শাড়ি, পায়ে জরি দেয়া স্যান্ডাল।

এভাবেই দুই বছর পার হয়ে গেল। বর্ষায় যখন মাঠ-ঘাট ডুবে যেতো তখন সে আসতে পারতো না এবং আমাদের দেখাও হতো না। কখনো যদি তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করতাম তাহলে সে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো যতোক্ষণ না তার দৃষ্টিসীমার বাইরে যাই। চল্লিশ বছর আগে গ্রামের সমাজ ব্যবস্থা এমন ছিল না যে, একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবতী মেয়ে একটা বিজাতীয় যুবক ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারে বা প্রেম করতে পারে।

কিছুদিন পরেই আমি ঢাকা চলে আসি। ছয় মাস পর যখন বাড়িতে এলাম তখন শুনলাম কাজলীর বিয়ে হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে যেন সব আলো এক ফুতে নিবে গেল। বাড়িতে থাকতে পারলাম না। আবার ঢাকায় ফিরে এলাম।

কাজলীকে হারানোর দুঃখ যে আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আবার যখন দেশে এলাম তখন শুনলাম কাজলীর দাদারা ইনডিয়ায় চলে গেছে।

২০০১ সালে কলকাতা যাই আমার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। আমার স্ত্রী *পিয়ারলেস* হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা কাছেই হোটেলে থাকি। দুই তিন দিন পর পর হাসপাতালে আসতে হয়। অনেক সময় আমি একাই আসি। এমনি সময়ে একদিন এখানেই দেখা হয় রবিনের সঙ্গে। রবিন কাজলের ছোট ভাই। তার কাছ থেকেই জানতে পারি কাজলী অসুস্থ এবং এ হাসপাতালেই তার এখন চিকিৎসা হচ্ছে।

আমার ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল কাজলীকে একবার দেখতে। রবিনকে বলতেই সে আমাকে ফিমেল ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। চল্লিশ বছর পর তাকে আবার দেখলাম। চুলগুলো ছোট করে ছাটা, হাত-পাগুলো শুকিয়ে গেছে। শাদা বিছানায় নির্জীবভাবে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে।

রবিন ডাকলো, দিদি, দেখো কে এসেছে। আমাদের পাশের গ্রামের মনিদা। মেজদার বন্ধু, তুমি তো মনিদাকে চেনো।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পাশ ফিরে চোখ মেললো। আমার দিকে তাকালো। মনে হলো যেন তার সমস্ত শরীর কাপছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এক সময় বললো, বসেন, মলিন হাসি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কাজলী, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো?

মাথা নেড়ে জানালো চিনতে পেরেছি।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোমার?

কোনো জবাব দিল না। শুধু দুই চোখের কোণ বেয়ে দুই ফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো।

রবিনের সামনে তেমন কিছু বলতে পারছি না। বললাম, আমি এবার আসি।

ঠোটের কোণে সেই মলিন হাসি। ক্ষীণস্বরে বললো, আবার আসবেন।

রবিনের সঙ্গেই বের হয়ে এলাম। তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম কাজলীর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থের অভাবে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে না। জামাইবাবু মারা গেছেন। একমাত্র ছেলে সেও বেকার।

তিন দিন পর হাসপাতালে এলাম। এ তিন দিন কাজলীর কথা অনেক ভেবেছি। চল্লিশ বছর আগের স্মৃতিগুলো একে একে মনের পর্দায় ভাসছিল। মনে মনে স্থির করে এসেছি আজ কাজলীকে একা পাবো। তার সঙ্গে অনেক কথা বলবো যা কোনোদিন বলতে পারিনি। ফেলে আসা স্মৃতিগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে তার রুগ্ন শরীর কিছু সময়ের জন্য হলেও আনন্দ-উচ্ছাসে ভরিয়ে তুলবো। তার জন্যে কিছু করতে পারি কি না তাও আলোচনা করবো।

পাচটার আগেই ফিমেল ওয়ার্ডে পৌছে গেলাম। কিন্তু একি! কাজলীর বেডে যে অন্য এক মহিলা। তাহলে...। ভাবলাম হয়তো বেড বদল হয়েছে। কর্তব্যরত নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, কাজলী দেবী কোথায়?

কাজ করতে করতে আবেগ শূন্যভাবে নার্স জবাব দিলেন তিনি গতকাল মারা গেছেন।

*এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে*

# বি

ক

তেত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে। আজও তোমাকে ভুলতে পারিনি এক মুহূর্তের জন্যও। এ লেখা নিশ্চয়ই তুমি পড়বে। কারণ, তোমার ছেলেরা অথবা ছেলেদের বাবা, সেই সঙ্গে তুমিও যাযাদি না পড়ে থাকতে পারো না। এ বিশ্বাসেই তেত্রিশ বছর পর তোমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

একজন কলেজ পড়ুয়া ক-কে ভালোবেসে বিশ্রাম নিতে গিয়েছিলে তোমাদের গ্রামের বাড়ি। বলেছিলে, ফিরে আসবে ছুটি শেষ হওয়ার দুই একদিন আগেই। আমার হয়ে তুমি আর কোনোদিন ফিরে আসোনি। তুমি চলে যাওয়ার পরেই জানলাম, তুমি অন্যের হয়ে গেছো। তোমাকে ধরে রাখার কোনো সাধ্যও আমার ছিল না। তুমিও আমার পক্ষে কোনো যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিতে পারোনি। কেননা একজন এইচএসসি পরীক্ষায় ফল প্রত্যাশীর কি ভবিষ্যৎ তা কেউ জানে না। তবুও বাবার সংসারে একজন ভক্ষক ছাড়া অন্য কিছুই নই আমি। শুধু তোমার-আমার অস্থির কিন্তু গভীর ভাবাবেগ ছাড়া আমাদের অনুকূলে ছিল না কিছুই। তাই তোমার আপা এবং আমার ভাইয়া ছিলেন নীরব দর্শক মাত্র। তুমি বিহীন আমি হয়ে গেলাম কিছুটা বোহেমিয়ান।

তিন বছর কেটে গেল। অনার্স পরীক্ষায় কোনো রকম পাস করলাম। সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম মরে যাবো এবং তা তোমার বাসার সামনেই। লুকিয়ে আব্বার পিস্তল নিয়ে তোমার বাসার সামনে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তোমার বর অফিসের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যাওয়ার পর পরই তোমার দরজার কড়া নাড়লাম। তুমিই দরজা খুললে। কি সুন্দর তুমি! বিশ্বাস করো বি, এতো সুন্দর আমি তখন এবং এখনো পর্যন্ত দেখিনি। সুন্দরীর সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু সুন্দর-এর আছে ব্যাপকতা। তাই তোমাকে সুন্দরই মানায়।

কেমন আছো আমার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তুমি আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল। তোমার দুই চোখ জলে ভাসলো। তোমার দশ মাস বয়সী প্রথম পুত্র তোমার কাধে ঘুমুচ্ছে। কি যে ভালো লাগছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে তুমি বললে তোমার বরকে দেখতে অনেকটা আমারই মতো।

বললাম, হ্যা ঠিক। তবে পার্থক্য শুধু তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি বর্তমান, আমি সাবেক। তুমি তোমার সন্তানকে রেখে আমার গালে এবং চুলে হাত বোলালে। সে স্মৃতি এখনো আমার চোখে ভাসছে। তোমার ছেলে বার বার আমার কোলে আসতে চাচ্ছিল। আমি আদর করে তাকে চুমু দিয়ে চলে এলাম। আমার চলে আসার পথে ডাগর চোখ তুলে তাকিয়েছিল। সেই চোখের চাহনি আজও দেখি। আমি মরতে পারিনি বি।

তোমার বিয়ের চোদ্দ বছর পর ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলাম। সে কথা আত্মীয়স্বজন সবারই জানা। ফুসলিয়ে নাবালিকা বিয়ে করার অপরাধে আঠারো মাসের জেল হয় আমার। লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক আদালতে আমার সাজা হয়। যদিও আমার স্ত্রী নাবালিকা ছিলেন না। এমবিবিএস থার্ড ইয়ারের একজন ছাত্রী কি করে নাবালিকা হয় তা কোনোভাবেই DMLA (District Mershal Law Administrator)-কে বোঝাতে পারিনি। যেহেতু আমার স্ত্রীর বড় ভাই উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার ছিলেন। তাই আমার এই শাস্তি। কারণ, কোর্ট ম্যারেজ করেছিলাম। ফলে আমার পরিবারের কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। মাত্র একদিনের শুনানিতে আমার শাস্তি হয়ে গেল। আমাকে যশোহর জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

জেলে ভালোই ছিলাম। সেখানে চোদ্দ মাস থাকার পরেই মুক্তি পেলাম জেল কর্তৃপক্ষের বদান্যতায়। আমি জানতাম, তোমার বরের চাকরির সুবাদে তোমরা যশোরেই থাকো। যেখানে যখন থেকেছি তোমার খবর জানতে চেষ্টা করেছি। কারণ, আমার আত্মীয় বলতে ছিল শুধু আমার স্ত্রী (তার বাবার ঘরে বন্দী) আর তুমি আমার সারা জীবনের আধ্যাত্মিক আত্মীয়।

বর্তমানে তুমি তোমার তিন সন্তান নিয়ে তুমি ভালো আছো। তোমার ছেলেরা সবাই মেধাবী এবং প্রতিষ্ঠিত তাও জানি।

আমিও দুই পুত্র সন্তানের পিতা। তারাও মেধাবী। স্কুল এবং কলেজের ছাত্র। স্ত্রী আমাকে অনেক আদর করে। আমিও আমার সর্বতোভাবে তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করি। আমার জন্য তার এমবিবিএস পাস করা হলো না। তবে সে বর্তমানে ঢাকার নামকরা স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবেও অনেক জনপ্রিয়। আমার সব কথা জেনেই বিয়ে করেছিল তিন বছর ভালোবাসাবাসির পর। আমরা একে অন্যের পরিপূরক, সুখের অভাব নেই। কিন্তু

তোমার জন্য যে অসুখ আমার হৃদয়ে সে অসুখ আমার কোনোদিন সারবে না। শুধু তোমাকে দেখতে মন চায়। একটিবার দুই চোখ ভরে আমার সুন্দর-কে দেখতে চাই। তোমার ডাক নামের বাংলা অর্থ হয়ে গেছি আমি (কষ্ট)।

তোমাকে আমি সব সময় মনে করি। তোমাকে ভুলতে পারি না এক মুহূর্তের জন্যও। আমার বুকটা শুকিয়ে গেছে। সারা দিন রোজা রাখার পর পানি পান করার যেমন ইচ্ছা লাগে তেমনি তোমাকে দেখার জন্য আমার বুক হাহাকার করে। ইফতারির সময় পানি পান করার পর যেমন ভালো লাগে, তোমাকে একটিবার দেখতে পেলে আমার তেমনি ভালো লাগতো।

বি, তুমি সব সময় আমার মনের মধ্যে থাকো, প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে মনে করি। এমনকি যখন নামাজে সিজদা দিই তখনো তোমাকে মনে পড়ে তাতে আমার কোনো প্রকার পাপ বোধ হয় না। ত্রিশ বছর তোমাকে দেখি না বি! তোমাকে কি আমি আর একটিবার দেখতে পাবো না?

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# মিষ্টি একটি বৌ

– সোহেল মাহমুদ দোলন

এই পৃথিবীর জীবন্ত মানুষ কখনো ঘুমের ঘোরে বা কখনো জেগে থেকে নানান স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্নের কোনো শেষ নেই। অফুরন্ত, অনাবিল স্বপ্ন। আমিও একটি স্বপ্ন দেখি মিষ্টি একটি বৌ যে আমাকে খুব আদর করবে, ভালোবাসবে। তার নাক, চোখ, কান, মুখ চুমোয় চুমোয় আমি ভরিয়ে দেবো। আমার অবিরাম স্পর্শে ও অস্থির হয়ে উঠবে। বলবে, তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো?

আমি বলবো, আমার এ হৃদয়খানি পৃথিবীর চার ভাগের মতো। তিন ভাগ শুধু তোমাকে ভালোবাসার জন্য আর এক ভাগ তোমার ব্যথায় সমব্যথী হওয়ার জন্য। সে তখন গভীর আবেগে আমাকে তার বুকের মাঝে জড়িয়ে চুমোয় চুমোয় একাকার করে দেবে। বলবো, তোমার মতো এতো সোহাগী বৌ পেয়ে পাগল হয়ে যাবো।

সে তখন আমার নাকে চিমটি কেটে বলবে, এই দুষ্টু ছাড়ো! এখন নয়, আগে বাতিটা নিভিয়ে নাও।

বলবো, ঠিক বলেছো, বাতির প্রয়োজন নেই। অন্ধকারের মাঝেই তোমার এই রূপ জ্যোৎস্না আলো ছড়াবে। আমি সেই আলোয় স্নান করবো সারা রাত। এভাবেই দিনের পর দিন চলতে থাকবে আমাদের ভালোবাসার প্রহরগুলো।

বৌ আমার সঙ্গে রাগ করবে, অভিমান করবে। আমি মিষ্টি মিষ্টি গান শুনিয়ে রাগ ভাঙাবো। আরো কতো কি করবো! ভালোবাসা দিবসে বৌকে সঙ্গে নিয়ে সারা দিন রিকশায় ঘুরে বেড়াবো। এরপর হঠাৎ একদিন আমাদের ঘর জুড়ে আলোকিত করতে আসবে এক টুকরো চাদ। সেই এক খণ্ড চাদের আলোয় ঝলমল করবে আমাদের ঘর। আমি বলবো, আমার সন্তান দেখতে ঠিক আমার মতো হয়েছে।

বৌ রেগে বলবে, না, আমার সন্তান দেখতে আমার মতো হয়েছে।

বলবো, না, আমার মতো।

বৌ বলবে, না, আমার মতো।

এভাবেই সৃষ্টি সুখের উল্লাসে সারা দিন মিছে ঝগড়া করবো আমরা। সোহাগে, আদরে পরিপূর্ণ থাকবে আমাদের ভালোবাসার ঘর। এটাই আমার স্বপ্ন। মিষ্টি একটি বৌ।

বাস্তবে আমার স্বপ্নের মতো না হোক অন্তত আমি চাই, আমার বৌ হোক আমার মনের মতো। কে হবে আমার এতো সাধের স্বপ্নের বৌ। শুধু একবার দেখবো তাকে আমার দুই নয়ন মেলে।

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# জাপানে দুই দিন

– কাশফিয়া আহমেদ

জাপানে যে বছর প্রথম পড়তে এলাম সে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই দেখি সব দোকানপাট, ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলো দারুণ সুন্দর করে সাজাচ্ছে। দোকানের বাইরে, ভেতরে নানান ডিজাইন করছে আর প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরেই একটা কর্নার জুড়ে রয়েছে আকর্ষণীয় সব গিফট ও চকলেট।

আমার জাপানিজ বান্ধবী বললো, ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে দেখেই এতো বিশাল আয়োজন।

সত্যিই বিশাল আয়োজন বটে। দোকানপাটের ভ্যালেনটাইনস কর্নারগুলো দারুণ মনোমুগ্ধকর। তবে আরো একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। ক্রমেই জানতে পারলাম জাপানের ভ্যালেনটাইনস ডে শুধু মহিলাদের জন্য অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারিকে শুধু জাপানের মেয়েরাই পালন করবে, ছেলেরা নয়। এদিনটা শুধু জাপানিজ মেয়েদের গিফট কেনার দিন এবং জাপানিজ ছেলেদের গিফট পাওয়ার দিন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে–তে সারা জাপানের মেয়েরাই চকলেট ও গিফট কিনবে এবং তা উপহার দেবে তার পুরুষ আত্মীয় বন্ধুকে। অর্থাৎ তার দাদা, নানা, বাবা, ভাই, শিক্ষক, বন্ধুদের এবং অবশ্যই তার কাছের মানুষটিকেও।

জাপানে আমার প্রথম ভ্যালেনটাইনস ডে–তে আমার ল্যাবের সব বান্ধবীদের সঙ্গে মিলে ল্যাবের ছেলেদের জন্য চকলেট কিনলাম একগাদা। সেই সঙ্গে আমাদের দুজন শিক্ষকের জন্যও গিফটসহ চকলেট কিনতে হলো।

জাপানিজ বান্ধবীরা জানালো, তারা তাদের নানা, দাদা, বাবা, মামা, ভাই, সহকর্মী ও বন্ধুদের জন্যও আলাদাভাবে চকলেট এবং গিফট কিনেছে। বিশেষ গিফট এবং চকলেট দিয়েছে তাদের মনের মানুষটিকে।

আমার কাছে জাপানের ভ্যালেনটাইনস ডে এক অন্য রকম আয়োজন মনে হলো। শুধু প্রেমিক পুরুষটিই নয়, বরং সকল পুরুষরাই ভালোবাসা পাচ্ছে নারীদের কাছ থেকে এই দিনে। সেই ভালোবাসাগুলো নানান ধরনের, নানান বর্ণের, নানান সম্পর্কের হলেও ভালোবাসা দিবসে সবার জন্য ভালোবাসা ছড়িয়ে দিচ্ছে জাপানিজ মেয়েরা। এটা হৃদয়কে খুব নাড়া দিল আমার।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনটা একটু খারাপও হলো এই ভেবে যে, এটা কেমন ব্যাপার! মেয়েরা শুধু ভালোবাসা ছড়িয়েই যাচ্ছে, প্রতিউত্তরে পাচ্ছে না কিছুই। এটা কেমন যেন বেমানান লাগলো। তবে আমার সেই খারাপ লাগাটা কেটে গেল অতি দ্রুতই।

ভ্যালেনটাইনস ডে–র মাত্র এক মাসের মাথায় ১৪ মার্চ জাপানে আবার সেই সাজ সাজ রব দেখা গেল। সব জায়গায় সুন্দর ডেকোরেশন, আলোকসজ্জা এবং সেই সঙ্গে ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলোতে আবারও গিফট ও চকলেটের সমারোহ।

ব্যাপারটি কি?

জানতে পারলাম, মার্চের ১৪ তারিখ হচ্ছে জাপানের হোয়াইট ডে (White day)। এ দিনটা ভ্যালেনটাইনস ডে–র পাল্টা বা কাউন্টার হিসেবে জাপানে উদযাপিত হয়ে আসছে। এই হোয়াইট ডে–তে জাপানের সব ছেলেরা গিফট ও চকলেট কিনবে এবং তা উপহার দেবে দাদি, নানি, মা, খালা, বান্ধবীদের এবং বিশেষ

গিফটটা দেবে তার সুইটহার্টকে। এ হোয়াইট ডে শুধু জাপানেই পালন করা হয় এবং ১৪ মার্চে জাপানিজ ছেলেরা তাদের ভালোলাগা, ভালোবাসা ছড়ায় সর্বত্র। আমার টেবিলেও ১৪ মার্চ ভরে গেল ল্যাবের ছেলে বন্ধুদের দেয়া চকলেট ও গিফটে। শিক্ষকরাও তাদের চকলেট ও গিফট দিতে ভোলেননি। ব্যাপারটা খুবই এনজয় করলাম।

জাপানে ভ্যালেনটাইনস ডে এবং হোয়াইট ডে দুটোই সমান আনন্দের সঙ্গে পালন করা হয়। ভ্যালেনটাইনস ডে-তে দুই ধরনের চকলেট দেখা যায়। একটা হচ্ছে গিরি চকো (Giri choco) এটাকে Obligatory chocolate বলা যায় অর্থাৎ এ চকলেট দেয়া প্রায় বাধ্যতামূলক। এ চকলেট মেয়েরা তাদের বাবা, ভাই, নানা, দাদা, সহকর্মী ও বন্ধুদের দেয়। আরেক ধরনের চকলেট হচ্ছে হোনমেই চকো (Honmei choco)। এটাকে True sweetheart chocolate-B বলে। এই Honmei choco শুধু প্রেমিক পুরুষটির জন্য। চকলেটের সঙ্গে প্রেমিকের জন্য নেকটাই, রুমাল, কোটপিন, শার্ট বা কোনো অর্নামেন্ট গিফট করা হয়। তেমনি হোয়াইট ডে-তেও প্রেমিকার জন্য চকলেটের সঙ্গে থাকে রুমাল বা কোনো দামি গয়না।

১৯৩৬ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে জাপানের কোবে শহরের মেয়েরা প্রথম ভ্যালেনটাইন-ডে পালন শুরু করে। এবং ১৯৫৮ সাল থেকে টোকিওতে এই দিন পালন আরম্ভ হয়। আর ভ্যালেনটাইনস-এর কাউন্টার ডে হিসেবে হোয়াইট ডে-এর পালন শুরু হয় ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫-এর মধ্যে। *দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে* সেই কথাটাই যেন বাস্তবিকভাবে হোয়াইট ডে-তে পালন করে জাপানিজ ছেলেরা।

ভালোবাসা চিরন্তন, চিরনতুন। তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেনটাইনস ডে আর ১৪ মার্চ হোয়াইট ডে, এই দুদিনে ভালোবাসার দেয়া-নেয়া জাপানিজ ছেলেমেয়েরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে যেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে ভালোবাসার রূপ এক ও অভিন্ন।

ভ্যালেনটাইনস ডে-তে আমার জাপানিজ বান্ধবী তার প্রেমিক মানুষটিকে যখন বলে, *আইশিতে মাস* অর্থাৎ ভালোবাসি তখন আমার মনে হয়, ভালোবাসার ভাষা কখনো বদলায় না, সব দেশে, সবকালে তা অপরিবর্তিত।

*ইবারাকি, জাপান থেকে*

## হরেক রকম

– মোহাম্মদ মামুন-উর-রশীদ

ফিল্ড রিসার্চার হিসেবে ব্র্যাক-এর T.U.P (গ্রামের অতি দরিদ্র মহিলাদের নির্বাচন করে গরু, ছাগল, মুরগি দিয়ে স্বাবলম্বী করা) প্রোগ্রাম-এ চাকরির সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের T.U.P উপকারভোগীদের নিয়ে কাজ করতে হয়েছে।

এমনিভাবে নীলফামারীর ডোমার থানার এক উপকারভোগীকে দেখেছি ব্র্যাক থেকে পাওয়া একমাত্র সম্বল গরুকে ওই বিধবা মহিলা ভিক্ষা করে জমানো দীর্ঘ দিনের সঞ্চয় থেকে দামি, সুন্দর, নতুন মশারি কিনে গরমের দিনে গরুকে ঘিরে রেখেছে যেন মশায় গরুকে কামড়াতে না পারে। অন্যদিকে নিজে গায়ে চট জড়িয়ে থেকেছে। আবার শীতের সময় ওই গরুকে চট দিয়ে নিজে মশারি জড়িয়ে থেকেছে যাতে গরুর শীত না লাগে। আচ্ছা, এটি কি ব্র্যাক এবং এই এনজিও-র দেয়া গরুটির প্রতি ভালোবাসা নয়? তাহলে নিচের ঘটনাটা কি ভালোবাসা বলা যায়?

আমাদের অফিসের আইনুল বাবুর্চি। সে প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট দিন যে অসুস্থ হয় সেটা কি ভালোবাসা বলা যায়? কোন দিন? প্রত্যেক মাসের ২ তারিখে দুই হাজার দুইশ টাকা বেতন পাওয়ার পর বাজার, পাউডার,

লিপস্টিক কিনে বৌয়ের কাছে যাওয়ার জন্য। এটাও যদি ভালোবাসা না হয় তাহলে নিচেরটা নিশ্চয় ভালোবাসা।

রানী আমাকে সব সময় বলে, কেউ যদি তোকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে গিয়ে মাছ, মাংস, পোলাও খাওয়ায় তাহলে আমাকেসহ জমি, ধন-সম্পদ সব কিছু তাদের লিখে দিয়ে আসবি।

আমি নাকি ভালো খাওয়া এতো পছন্দ করি যে, তাকেও (রানীকে) ভুলে যাই। এটা খাওয়ার প্রতি ভালোবাসা নয়?

আমার বাবা, মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। জীবনের প্রয়োজনে আমরা পাচ ভাইবোন বাড়িতে থাকতে পারি না। বাড়িতে আমার বাবা ভালো কিছু যদি বাজার করেন তবে আমার মা সেটা রেফ্রিজারেটরে উঠিয়ে রাখেন আমরা পাচ ভাইবোন বাড়িতে গিয়ে খাবো এই আশায়। এটা যদি ভালোবাসা না হয়। তাহলে বাবা, মা এ বছর হজে যাওয়ার আগে (মায়ের ধারণা, সেখানে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসবেন না) তাদের জমানো টাকা, সোনা, গয়না কোথায় রেখেছে সেই গোপন জায়গা দেখে যাওয়ার জন্য মা আমাকে শুধুই গোপনে ডেকেছে কেন? আপা, ভাইয়া, ভাবী, রানী, তোদেরকে মা বলতে নিষেধ করেছে বলে বলবো না।

আমার বৃদ্ধা দাদি আমার বাবাকে ছোট রেখে মারা যান। এই শোক সামলে উঠতে পারেন না আমার দাদা। তিনিও ওই মাসে মারা যান। কয়েক দিনআগে পত্রিকায় দেখলাম স্বামী-স্ত্রীর ছয় ঘণ্টার ব্যবধানে মৃত্যু। এগুলো ভালোবাসা? আমার ক্যাম্পাসের (জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি) এক গার্ডমামার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তার বেশির ভাগ সময় ডিউটি থাকতো (ভীষণ নীরব এলাকা) সুইমিংপুল এরিয়ায়।

একদিন ডেইরি ফার্মে বসে আমি এবং গার্ডমামা চা খাচ্ছি। তখন আমাদেরই এক বান্ধবীকে দেখিয়ে মামা বললেন, ওই খালা (আমাদের বান্ধবী) সেদিন এক মামাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে সুইমিংপুলে এসে গল্প করে, হাত ধরাধরি করে হাটে, একজন অন্যজনকে কমলা খাইয়ে দেয়, সঙ্গের ওই মামাও অনেকগুলো কমলা নিয়ে এসেছিলেন। ওমা! পরের দিন দেখি ওই খালা (আমাদের বান্ধবী) নতুন আরেক মামাকে নিয়ে সুইমিংপুলে এসেছে। আর ব্যাগ থেকে খালা আগের মামার আনা কমলা বের করে নতুন মামাকে খাইয়ে দিচ্ছে।

আমার পরিচিত একজন পুলিশের এসআই আছেন। তার ঢাকাতে দুইটি বাড়ি আছে। প্রশ্ন করেছিলাম, কিসের ভালোবাসায় এই বেতন দিয়ে ঢাকাতে দুটি বাড়ি করেছেন?

উত্তর দিলেন, ভবিষ্যৎ-এর ভালোবাসায়।

আমার ভাগ্নেকে কিছুদিন আগে সেলুন-এ নিয়ে গিয়েছিলাম চুল কাটানোর জন্য। আমার ভাগ্নে সামনের চুল হাত দিয়ে ধরে রেখে বলে, মামা, সামনের চুল কাটবো না, শাহরুখ খানের মতো বড় রাখবো। ব্যাকব্রাশ করবো।

পরের দিন আমার আপার কাছে শুনলাম। ভাগ্নের নাকি কোচিং ক্লাসে একজন বান্ধবী আছে। ভাগ্নের নাম অলিন্দ, বয়স সাত বছর।

সবশেষে ভাগ্নের চুল না কাটাকে এবং শাহরুখ খানের মতো হওয়াকে কি ভালোবাসা বলবেন?

শেষে আবারও রানীর নাম লিখে লেখা শেষ করলাম। আমি নিশ্চিত সে বলবে, যায়যায়দিনে লেখা পাঠালি আর আমার নাম মাত্র চারবার লিখলি। যাহ, তোর সঙ্গে কথা বলবো না। এবং সত্যি, সত্যিই হয়তো তিন চার ঘণ্টা কথা বলবে না। এটা ভালোবাসা কি না জানি না।

*নীলফামারী থেকে*
mamunred@yahoo.com

# অপূর্ণ মাতৃত্ব

এ ভালোবাসা দিনে সবাই ভালোবাসা পেতে চায়, আমিও চাই। তবে একটি সন্তানের ভালোবাসা পেতে। কারণ আমি কখনো মা হতে পারবো না। বড় হয়ে জানতে পারলাম আমার শরীরের একটি অঙ্গ নেই। সে জন্যেই আমি কোনোদিন মা ডাক শুনতে পারবো না। একটি মেয়ে হয়ে তা বিশ্বাস করা যায় না, মেনে নেয়া যায় না আমি নারী, না কি নর? আল্লাহ নারী করে সৃষ্টি করেছে ঠিকই অথচ নারীর যেটা ধর্ম সন্তান ধারণ করা আর কর্ম স্বামীর সেবা করা সেই ধর্ম-কর্ম থেকে আজ আমি বঞ্চিত।

১৯৯৫ সালের কথা। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। আমার এক দূরসম্পর্কের দাদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোর মেন্স হয় না?

তখনো আমি বুঝি না মেন্স কি। তাই পাল্টা প্রশ্ন করি, দাদি মেন্স কি?

দাদি তখন হেসে বলেন, এতো বড় হয়েছিস, মেন্স কি বুঝিস না।

বললাম, সত্যি আমি বুঝি না দাদি।

তাহলে শোন। একটি মেয়ের যখন বারো তেরো বছর বয়স হয় তখন তার প্রতি মাসে মাসিক অর্থাৎ মেন্স হয়। তোর যখন হয় না তখন ভালো ডাক্তার দেখাস, পারলে আমাকে নিয়ে যাস ডাক্তারের কাছে।

এদিকে আমাদের অভাবী সংসার, লবণ আনতে পান্তা ফুরায়। কিভাবে, কি করবো বুঝতে পারি না। পরিবারের কাউকে কিছু বলতেও পারি না। এভাবে কেটে গেল একটি বছর। যখন ক্লাস নাইনে উঠলাম তখন চিন্তা করি, ডাক্তার দেখাতে টাকা কোথায় পাবো। ঠিক সেই সময় চিন্তার অবসান ঘটলো। একদিন ক্লাসে স্যার বললেন তোমাদেরকে আজ উপবৃত্তি দেয়া হবে। আমাদের স্কুলে এই প্রথম উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। সবাই মহা আনন্দ টাকা পাবো। তাও আবার আমরাই সবচেয়ে বেশি টাকা। পাবো ছয়শ দশ টাকা।

টাকা পেলাম। তারপর দাদিকে নিয়ে ভালো এক মহিলা ডাক্তারের কাছে গেলাম।

ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললো তুমি কোন ক্লাসে পড়।

বললাম, ক্লাস নাইনে।

বললেন, ভালো করে পড়াশোনা করতে। আরো বললেন, তোমার জন্মগতভাবে জরায়ু নেই। তবে তোমার একটা অপারেশন করলে স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে। কিন্তু মা হতে পারবে না।

ডাক্তারের কথা শুনে মনে হলো, এই ছোট্ট বয়সে প্রচণ্ড রকম একটা মানসিক আঘাত পেলাম। অনেক চেষ্টা করলাম আঘাতটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে। কিন্তু পারলাম না। পারলাম না ভালো পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাড়াতে। কোনো রকম এসএসসি পাস করলাম। তারপর আর সম্ভব হলো না একজন গরিব পিতার পক্ষে পড়াশোনার খরচ চালানো। কারণ, যাদের পেটে দুমুঠো ভাত ঠিকভাবে জোটে না তাদের আবার উচ্চশিক্ষা! ব্যস, বন্ধ হলো পড়া।

আগে অনেক লাল, সবুজ, নীল স্বপ্ন দেখতাম। আমার বিয়ে হয়েছে, ফুটফুটে দুটি বাচ্চা হয়েছে, আমাকে বার বার মা বলে ডাকছে, মা মা মা। যতোদিন যাচ্ছে ততো বেশি এই স্বপ্নগুলো আমাকে অক্টোপাসের মতো আকড়ে ধরছে। কিন্তু আমি আর পারছি না এ যন্ত্রণাগুলোকে পাথর চাপা দিতে। তাই আমি মা হতে চাই। একজন আদর্শ মা। পৃথিবীতে এমন কেউ আছেন যার স্ত্রী ছোট্ট দুটি সন্তান রেখে ওপারে চলে গেছেন। আর সন্তানেরা তার মাকে খুজছে। একজন স্বামী তার সহধর্মিণীকে খুজছেন। যদি এ রকম কেউ থেকে থাকেন, তাহলে প্লিজ আমাকে খুজে নিন। আমি আপন করে নেবো তাদেরকে। কখনো বুঝতে দেবো না তাদের মা নেই।

মা না হওয়া যন্ত্রণা যে কেমন তা ভুক্তভোগী মাত্র ই জানে। আমার চাওয়া মতো কাউকে না পেলে আমিও এ রকমই থেকে যাবো। তবু কখনো কারো প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে যাবো না। কারণ, একজন নারী তার সব জিনিসের ভাগ দিতে চায়। কিন্তু স্বামীর ভাগ সহজে দিতে চায় না। আমিও চাই না দিতে। জানি না, আমি আজও কোনো সন্তানের মা হতে পারবো কি না।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

# ভয়

– জিদনী

কবে থেকে জানি না তাকে আমি ভালোবাসি। তবে যখন থেকে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলাম তখন থেকেই আবিষ্কার করলাম, আকাশটা বড় বেশি নীল হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি সজীব আর চারপাশটা হঠাৎ করেই অসহ্য রকম সুন্দর হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির এই বিশাল ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও বড্ড একা হয়ে গেলাম। সে ছাড়া কাউকে পার্থিব জগতের বাসিন্দা বলে মনে হতো না।

এতো যে তোলপাড় করা ভালোবাসা তার পরিণতি কি হবে? মিলন, না বিরহ? সে চিন্তায় আমার প্রায় মাথা খারাপ অবস্থা! কিন্তু সাহস করে তাকে কথাটা জানাতেই পারলাম না। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধবরা দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য নিয়ে যা যা শিখিয়ে দিতো সেগুলো তার সামনে দাড়িয়ে এক বর্ণও মনে পড়তো না।

অবশেষে বন্ধু-বান্ধবরা হাল ছেড়ে দিয়ে মন্তব্য করলো, এই সামান্য কথাটা বলার সাহস যার নেই তার কচু গাছের সঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।

হায়রে! সামান্য কথাও যে ক্ষেত্র বিশেষে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে তা তারা বুঝবে কি করে? তবে তাদের একটা কথা ঠিক, আমার সমস্যার সমাধান হলো প্রয়াত হয়ে যাওয়া। কিন্তু মরবো কি করে? সত্যি সত্যি তো আর কচু গাছের সঙ্গে গলায় দড়ি দিতে পারি না। শেষে ঠিক করলাম, বিষ খেয়ে এই হতচ্ছাড়া জীবনের ইতি টানবো।

কিন্তু *অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।* আমি তো আর বাংলা ছবির নায়িকা নই যে, পরিচালক বিষের শিশি রেডি রাখবে। সারা বাড়ি খুজে মানবনাশক তো দূরে থাক, কীটনাশকও পেলাম না।

মাকে ডেকে বললাম, মা, আমার ঘরে ইদুর দেখলাম। বাবাকে বলবে ইদুরের ওষুধ মানে ইদুর মারার ওষুধ আনতে।

মা তো অবাক, ইদুর? কই দেখিনি তো! দাড়া আজই তোর বাবাকে বলছি।

কিন্তু পরদিন গালভরা হাসি নিয়ে মা যে জিনিসটা আমাকে এনে দিলেন তাতে একটুও হাসতে পারলাম না। একটা ইদুরের কল!

আমি রীতিমতো হতাশ! পানিতে ডুবে মরবো কি করে? একে তো সাতার জানি, তার উপর আশপাশে কোনো নদী তো দূরে থাক, পুকুর পর্যন্ত নেই। ফ্যানের সঙ্গে দড়ি দেয়া যেতো। কিন্তু আধহাত জিভ বেরিয়ে আসা চেহারাটা কল্পনা করতেই প্ল্যানটা বাতিল করে দিলাম। হাতের কবজির কাছে শিরাটা কেটে দিলেই নাকি...। পারবো না বাবা, অতো সাহস নেই।

তাহলে?

দি আইডিয়া! আমাদের চার তলা বাড়ির ছাড় থেকে লাফ দিই না কেন? যেই ভাবা সেই কাজ! শুভ দিন দেখে এক বিকেলে মরণপণ নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। হঠাৎ মনে পড়লো। এই যাহ! সুইসাইড নোট তো লেখা হলো

না। দৌড়ে নিচে গিয়ে একটা চিরকুটে লিখলাম, *আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী আমার নিয়তি আর ভীরুতা। কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।*

চিরকুটটা বালিশের নিচে রেখে ছাদে চলে এলাম। রেলিংয়ের কাছে দাড়িয়ে কলেমা পড়ছি। হঠাৎ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা রিকশা গেটে এসে দাড়ালো। রিকশা থেকে কে নামছে? আরে, সে না?

আমার সাধের সুইসাইড শিকেয় তুলে নিচে নেমে এলাম। গেট খুলে নিচু স্বরে কোনোমতে বললাম, নাফিসভাই, ভালো আছেন?

এই তো আছি! তোমাদের কি খবর?

জি ভালো।

আংকল আছেন?

জি আসুন। ভেতরে আসুন।

আমার আর ছাদ থেকে পড়ে মরা হলো না। ভেবে দেখলাম, আমি যখন মরার জন্য তৈরি তখন খোদা তাকে পাঠিয়ে দিলেন। তার মানে এভাবে আমার মরণ লেখা নেই। তাই এ প্ল্যানও বাতিল। আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলাম। প্রতিদিন ডজন ডজন আইডিয়া নিয়ে ভাবি আর নেড়েচেড়ে বাতিল করে দিই। কোনোটাই মনে ধরে না।

একদিন হঠাৎ করেই সুযোগ এলো। ফার্মগেট থেকে ফেরার পথে দেখলাম, এক ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা নানান ধরনের কীটনাশক বিক্রি করছ। কয়েক প্যাকেট কিনে আনলাম। কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে লিখলাম তখন আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এরপর এক গ্লাস পানির সঙ্গে বেশ কয়েকটা ওষুধ গিলে নিলাম।

যন্ত্রণা হচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণা। পুরো শরীর পাক দিয়ে উঠছে। বিরতিহীন যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন চারদিকে তাকিয়ে দেখি, প্রিয়জনের উদ্বিগ্ন মুখের জীবন্ত প্রদর্শনী, মা হাউ মাউ করে উঠলেন, কেন, কি হয়েছিল? কে...।

কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার ধমকে উঠলেন, না, এখন কোনো প্রশ্ন করবেন না প্লিজ!

ছোট বোনটার মুখে শুনলাম, আমাকে নাফিসভাইদের গাড়িতে করে হাসপাতালে আনা হয়েছে। নাফিসভাইও সারাক্ষণ আশপাশে ছিলেন। উৎকণ্ঠায় নাকি আধখানা হয়ে গেছেন। আমার জ্ঞান ফেরার খবর শুনে তবে বাড়ি ফিরেছেন। ব্যাপার কি? বাবার বন্ধুর ছেলে হিসেবে দায়িত্ব পালন নাকি...?

পরদিন নাফিসভাই যখন এলেন তখন দেখে রীতিমতো আতকে উঠলাম। ভরাট মুখটা শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে। দুই দিনেই চোয়ালের হাড় বেরিয়ে গেছে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর নিচে রাত জাগার চিহ্ন স্পষ্ট! এসেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, এতো বুদ্ধিমতি মেয়ে তুমি। এমন একটা পাগলামি কেন করলে বলো তো?

চোখের জলের সঙ্গে রীতিমতো কুস্তি করে আটকে রাখলাম। অতি কষ্টে স্থির কণ্ঠে বললাম, কোনো একজনকে ভীষণ ভালোবাসি। কিন্তু বলার সাহস নেই, তাই।

কে সে? আমাকে বলো, আমি তোমার হয়ে জানিয়ে দেবো।

আপনি জানাবেন? আপনি?

আমি। তুমি বোঝোনি, আমিও কখনো বলিনি, আমি তোমাকে পছন্দ করি। বোকার মতো একা একা আমি তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। তোমার মতামত নেয়ার ফুরসতই পাইনি। যখন বলবো বলবো করছি তখনই তোমার এই কাণ্ড। আমি সব কিছুর বিনিময়ে তোমাকে সুখী দেখতে চাই। অ্যাট এনি কস্ট। যে কোনো দামে। তুমি শুধু নামটা বলো, বাকি দায়িত্ব আমার। বলো কে সে?

আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না ভুল শুনছি? আমার ভেতরে কথাগুলো বার বার অনুরণিত হচ্ছে! অবাক বিস্ময়ে, আনন্দের আতিশয্যে ভাষা হারিয়ে ফেললাম। নিজেকে প্রাণপণে সামলে নিয়ে তার দিকে চেয়ে দেখি, চোখে

প্রশ্ন নিয়ে সে আমারই দিকে চেয়ে আছে। চোখ বুঝে মরিয়া হয়ে বললাম, নাফিসভাই, সে হচ্ছেন আপনি। অনেকবার আপনাকে বলার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আপনার সামনে গেলেই আমার মাথায় শর্ট সার্কিট হয়ে যায়। সমস্ত কথা তালগোল পাকিয়ে যায়, আপনার কারণেই আমার এতো কষ্ট। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলাম।

আমি এখনো চোখ বুজেই আছি। খুলবো কি না বুঝতে পারছি না। নাহ, খুলেই ফেলি। নতুন জীবন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এখনো চোখ বুঝে থাকলে চলবে কি করে?

*আশকোনা, ঢাকা থেকে*

# বিপর্যস্ত

– পুতুল

হৃদয়ে যে বয়সে প্রেমের আনাগোনা শুরু হয় সেই বয়সে প্রেম এসেছিল নীরবে, পারিনি তা জানতে। নীরব প্রেমের পর সরব প্রেম এলো। দিন-ক্ষণ দেখে আমার আত্মীয় পরিজনেরা আমার বিয়ে ধার্য করলেন। শ্রাবণের এক দুপুরে মেরুন শাড়ি গায়ে জড়িয়ে আমার বিয়ে হলো।

প্রেম কথাটার অর্থ এক একজনের কাছে এক এক রকম। দুটি মনের মিলন হবে ধরে নিয়ে নারীর দিকে পুরুষ কিংবা পুরুষের দিকে নারী ধাবিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত মিলন হয় হয়তো। কিন্তু সেটা কতোটা? দুটি মানুষের চেহারা যেমন কখনোই পুরো মিল হয় না তেমনি মানুষের মনও একজনের সঙ্গে আরেকজনের পুরো মিল কখনো হয় না। আর হয় না বলেই প্রেম বিদায় নেয় বিয়ের আগে অথবা পরে। কিন্তু যারা সারা জীবন সুখে ঘরকন্না করেন তাদের ক্ষেত্রে কি বলবেন?

আমি বলবো, মানিয়ে নেয়া, যে যতো তাড়াতাড়ি একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তারা ততো সুখী। এই মানিয়ে নেয়া ব্যাপারটাও আবার দুই পক্ষের সমান হয় না। কারোর কম, কারোর বেশি। শেষ পর্যন্ত কোনো রসায়নই পঞ্চাশে পঞ্চাশ নয়।

আমার কাছে প্রেমের অপর নাম হচ্ছে ভালোবাসা। আমি তোমাকে ভালোবাসি এই বাক্যটা আমার কাছে মনের প্যারাসিটামল। বুঝতেই পারছি আমার এসব আগডুম-বাগডুম কথায় পাঠক-পাঠিকারা বিরক্ত হচ্ছেন। তারচেয়ে বরং চলুন আমার নিজের কথা বলি।

প্রেমে পড়ার কোনো বয়স নেই। তবুও তো একটা বয়স আছে। সেই বয়ঃসন্ধিকালে কিংবা প্রাকযৌবনে যখন আমার বয়সী মেয়েরা প্রেমে পড়ে তখন প্রেম করাটা আমার কাছে ছিল সুদূর গ্রহের কোনো বিষয়। কারণ, আমার বাবা। মিলিটারি বাবার কন্যা আমি। তার দাপটে বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। আর আমি তো কোন ছার। আমার মিলিটারি বাবার ভয়ে কোনো ছেলেও সাহস পেতো না আমার হৃদয় পাচিল টপকাতে।

তারপরও যে মুহূর্তে প্রেম সব বাধা-বিপত্তি পার করে চোরা গলিতে ঢোকে সেই বয়স মানে আঠারো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো। হৃদয়ে, শরীরে তখন প্রচণ্ড প্রেমের জোয়ার। তাই বিবাহিত স্বামী পুরুষটিকে ঘিরে যতো ভালোবাসা পাক খেতে লাগলো। ভালোবাসা আছড়ে পড়লো তার হৃদয়ে, তার শরীরে। ভালোবাসার শর্ত বিয়ে। আর বিয়ের শর্ত শরীর। সেই ভালোবাসার শরীর খেলায় মেতে উঠলাম দুই নারী-পুরুষ।

সাতাশ বছরের যুবকটি আঠারো বছরের মেয়েটির হৃদয়ের আবেগকে সব সময় আশ্রয় করতো শরীরকে। মেয়েটি তার স্বামীর কাছে তার কিশোরী বেলার গল্পের ঝুড়ি খুলে বসতে চাইলো। চাইতো ছোটখাটো দুঃখ ভুলিয়ে পুরুষটি তার ভালোবাসার মলম লাগাবে মেয়েটির হৃদয়ে। কিন্তু সাতাশ বছরের অভুক্ত শরীরটি আঠারো বছরের হৃদয়ের বদলে শরীরে বেশি তৃপ্ত হতো। মেয়েটি খুব মানসিক যাতনা বোধ করতো। তারপর

মেয়েটি মানিয়ে নিতো স্বামীটি যখন শারীরিক প্রসাদে তৃপ্ত তখন তাকে তা দিয়েই পূজো দিতে হতো। তবে বিশেষ দিনগুলোতে স্বামী নামের জন্তুটি হয়ে উঠতো হিংস্র। মেয়েটি নীরবে কাদতো। এর নাম কি প্রেম? এর নাম কি ভালোবাসা! ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শরীর-মন যে ভালোবাসায় সাড়া না দিল সে ভালোবাসার কি দাম?

মেয়েটির মন সব সময় আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কথাটি শুনতে চাইতো। পুরুষটি শোনাতো, রাজি যদি তাকে শরীর দিয়ে তৃপ্ত করতে পারি। মাসের বিশেষ দিনগুলোতে সে অপবিত্র স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে রাজি ছিল না। ভালোবাসি বলা তো দূরে থাক।

মেয়েটি বার বার বলতো, একবার বলো, তুমি আমাকে ভালোবাসো। স্বামীটি বলতো, বিরক্ত করো না, সুস্থ হয়ে ভালোবাসতে এসো। দৈহিক মিলন ছাড়া ভালোবাসা আমি বুঝি না।

এমনি সময় তার ব্যবহার মোটামুটি ভালোই বলা চলে। নিজের প্রয়োজন মতো তাকে ভালোবাসতো? প্রয়োজন ফুরালে তার ভালোবাসা ওপাশ ফিরে শুতো।

এভাবে মানিয়ে পথ চলতে লাগলাম আমি। দিনের পর দিন মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। তার রুচি ও মানসিকতার ছিল বিস্তার ফারাক। অবসরে যখন বই পড়ে ও গান শুনে সময় কাটাতাম সে অবসরে টিভি এবং ফ্যাশন চ্যানেলে আধা ন্যাংটো মেয়েদের দেখতো। ঈদের হাজারও বাজার সারতে সারতে যখন রাস্তার পাশে পত্রিকার স্টল থেকে ভালোবাসা সংখ্যা যায়যায়দিন কিনতাম তখন সে ফোড়ন কাটতো, পয়সা খরচ করে মানুষ পত্রিকা পড়ে এই প্রথম সে নাকি দেখলো।

বৃষ্টির রাতে গৃল ধরে দাড়িয়ে বৃষ্টির ঝাপটা খেতে খেতে পেছন থেকে তার আদর আমার ভালো লাগতো। কিন্তু আমি যেমন ধীরে বন্ধু, ধীরে আদরে বিশ্বাসী সে তেমনি দ্রুত বিছানায় গিয়ে তার কাজ সারতে পারলেই খুশি। তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে তার মধ্যে থাকতে হবে ভালোবাসা আদর।

আসলে মেয়েরা অনেক সাটল (Subtle) অর্থাৎ সূক্ষ্ম। তাদের আবেগ, অনুভূতি, রোমান্টিক, ভালোলাগা এগুলো খুব সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রোমান্টিকতার আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের বোধগম্য হয় না।

এরপর এলো সেই চরম মুহূর্ত। গর্ভবতী হলাম। কিভাবে পার করেছি সেই কঠিন দিনগুলো তার বৃত্তান্ত লিখতে বসলে এক হাজার শব্দে কুলাবে না। সুতরাং সে প্রসঙ্গ থাক। বাচ্চা প্রসবের পর অপেক্ষা করেছি হাসপাতালের বেডে শুয়ে, কখন তার হাত আমার কপালে রাখবে এবং বলবে, তুমি ভালো আছো তো। না, সেই মুহূর্ত আমার জীবনে আসেনি। আমি ভালোবাসা পাইনি। যা পেয়েছি তা হলো, সাময়িক উত্তেজনা। এই উত্তেজনা কেটে যাবার পর ফাক বাড়তে থাকে, বাড়তো ফাকিও।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। সে ব্যস্ত হয়ে ছিল তার শারীরিক তৃপ্তি ঘটাতে। ব্যস্ত ছিলাম আমিও। কতোদিন শরীর তাকে খুব কাছে পাইনি। কতোদিন ভালোবাসাবাসি হয়নি। দুজনের কাছে আসার চরম মুহূর্তে কেদে ঘুম থেকে জেগে উঠলো নবজাতক। তখন তার রাগ ও গালিগালাজ কলমে আর না-ইবা লিখলাম।

এভাবে আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হলো। আস্তে আস্তে সে আরেকটি মেয়ের সঙ্গে বাইরে সম্পর্ক গড়ে তুললো। দিনে দিনে সংসারে সে দায়িত্ব বোধ, ভালোবাসা সব থেকে দূরে সরিয়ে নিল নিজেকে। আমিও ক্লান্ত হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম সংসার নামের জাল থেকে। জীবনে প্রথম পুরুষ ভালোবাসাহীনতায় আমাকে কাদালো। দুজনের দুটি পথ আলাদা হয়ে গেল।

তারপর মনে হয় মাঝে মধ্যে :

ভুল প্রেমে কেটে গেছে ছাব্বিশ বসন্ত<br>
তবু এখনো কেমন যেন হৃদয় টাটায়<br>
প্রতারক পুরুষেরা এখনো আঙুল ছুলে

পাথর শরীর বেয়ে ঝরনার জল নামে
একবার ডাকলেই
ভুলে যাই পেছনের সজল ভৈরবী
ভুলে যাই মেঘলা আকাশ, না ফুরানো দীর্ঘ রাত
একবার ডাকলেই
সব ভুলে পা বাড়াই নতুন ভুলের দিকে
একবার ভালোবাসলেই সব ভুলে কেদে উঠি অমল বালিকা।

*ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## চাওয়া এবং পাওয়া

ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি। তখন আমার এক মাসিমণির বিয়ে হয়। আমার বাবা নিমন্ত্রণ করে তাদের খাওয়ান। আমার মেসোমশাই মানে খালু আমাকে প্রথম দেখেই বলেন, তোকে আমার ভাইয়ের ছেলের বৌ বানাবো। আমাকে এই কথা বলে খুব ক্ষেপাতেন। এমন করে যেদিন তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন সেদিনই এই কথা বলে আমাকে ক্ষেপাতেন। আমিও খুব খুশি হতাম। তখন সবাই এ কথাকে নিছক ইয়ার্কি মনে করতো।

আমরা দুই বোন, দুই ভাই। আমি সবার ছোট। দেখতে দেখতে এসএসসি পাস করলাম। আমার বোনেরও বিয়ে হয়ে গেল। বোনের বিয়ের পর পরই বাবাকে মেসোমশাই সিরিয়াসভাবে বলতে লাগলেন আমার বিয়ের কথা তার ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে।

বাবা তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তারপর তার পীড়াপীড়িতে বাবা তার ভাইয়ের ছেলেকে দেখতে গেলেন বরিশালে। ছেলে চাকরি করে সিলেটে। পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

তারপর বাবা তাদের আমাকে দেখতে আসতে বললেন। তখন ব্যাপারটা আমার তেমন বিশ্বাস হলো না। কিন্তু যেদিন তারা দেখতে এলো সেদিন বিশ্বাস হলো। তারা পছন্দ করলো। এবং আংটি পড়াতে চাইলো। মা রাজি হননি। এ জন্য পারেনি। ছেলে পক্ষ বিয়ে ধার্য করতে চাইলো আমার এইচএসসি পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে।

বাবা মা তখন রাজি হননি। তারা বলেন, পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে বিয়ে হলে কেউ পাস করে?

তারা বাদ সাধলেন। বলেন, এখন হলে হবে, না হলে না । তখন কথাবার্তা অফ রইলো।

এর মধ্যে আমার মামি একজন প্রবাসী ছেলে নিয়ে এলেন আমাকে দেখাতে। তখন আমার মনের বারোটা বেজে গেছে।

বরিশালের ছেলেটার একটা ছদ্ম নাম দিই। ধরা যাক, প্রীতম। প্রবাসী ছেলেটাকে সবাই পছন্দ করলো আমি ছাড়া। সবাই প্রবাসী ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দিতে বললো। আমি তখন খুব কান্না–কাটি করলাম।

ছোটবেলা থেকে প্রীতমের নাম শুনতে শুনতে কখন যে তার প্রেমে পড়লাম বুঝতে পারলাম না। আমার মনের কথা দিদিকে বললাম, তার কাছে সব বলতাম।

দিদি (মানে আমার বড় বোন) বললেন, প্রীতমকে জানা তোর মনের কথা।

দিদির কথামতো প্রীতমের ঠিকানা জোগাড় করে সিলেট তার কর্মস্থলে চিঠি দিলাম নাম ঠিকানা বিহীন। সে আমার বান্ধবীর নামে চিঠি দিল আমার কাছে।

বাবা একদিন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন, চিঠি যে আমার বান্ধবীর নয়, প্রীতমের ।

আমি ছোট বলে একটু বেশি সুবিধা পেতাম।

বাবা যখন বুঝলেন প্রীতমকে আমি ভালোবাসি তখন তার কাকাকে আবার অনুরোধ করলেন বিয়ের ব্যাপারে। তিনি এবার রুক্ষ ব্যবহার করতে লাগলেন। বললেন, এক লাখ টাকা এবং টিভি, রেফ্রিজারেটর দিতে হবে।

এই টাকা পয়সার ঝামেলায় দুই বছর চলে গেল। অনার্সে সমাজকল্যাণ বিভাগে ভর্তি হলাম। এবং আমাদের চিঠিপত্রের কথা কিভাবে যেন ফাস হয়ে গেল। প্রীতমের মা, বোন, ভাই রাজি ছিলেন না। আমাকে তারা বিয়ে করতে প্রীতমকে নিষেধ করলেন।

অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় সবার অমতে আমাদের দুজনের সুখের কথা ভেবে দুপক্ষের গার্ডিয়ান রাজি হলো।

বিয়ে হলো ঠিকই কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে আত্মার সম্পর্ক হলো না। বাবা তাদের সব দাবি পূরণ করেছেন। আমার ইচ্ছা, আমার ভালোবাসাকে বাবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।

যেদিন আমাদের ফুলশয্যা হলো সেদিন আমি তো ভয়ে খাটের কোণায় গিয়ে শুয়েছিলাম, একটা কথাও বলিনি। কিন্তু তাকে দেখিনি এমনকি ছবিও না। না দেখেই প্রেম করেছি, সে দেখেছে।

যাই হোক। ফুলশয্যায় সে গিয়ে প্রথমে কাশ দিল। অনেকক্ষণ পর বলে, প্রেমা ওঠো। তুমি এই রকম করছো কেন?

আমি তো ভয়ে, লজ্জায় মরি।

তারপর সে আস্তে আস্তে আমাকে ওঠালো। হাতে আংটি পরালো। আমাকে যেই সে ধরলো অমনি আমার সারা শরীর ভালো লাগায় অবশ হয়ে গেল। আমি কোনো কথা প্রথমে বলিনি।

সে বললো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অবশেষে তোমাকে পেলাম।

তার কথা তখন আমার শুনতে এতো ভালো লাগছিল যে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম।

আমাকে সারা রাত গল্প শোনাতে শোনাতে ভোর করলো।

দ্বিতীয় রাতে বললো, তুমি আমাকে একটা কিস দাও।

আমি লজ্জায় মরে যাই। দিতে গিয়েই ফিরে আসি।

সে আমার সারা গায়ে আদরে ভরিয়ে দিল। কিন্তু পূর্ণ মিলন পাচ দিনের চেষ্টায় সে পারলো না।

সাত দিনের ছুটি শেষে বিয়ে করা নতুন বৌ রেখে চলে গেল সিলেটে। দুই মাস একা বরিশালে শ্বশুরবাড়ি ছিলাম। সে পূজায় এসে আমাকে নিয়ে গেল।

এখন সারাক্ষণ আমাকে আছন্ন করে রাখে। তার ভলোবাসায় আমি মুগ্ধ। শ্বশুরবাড়িতে তেমন স্বীকৃতি মেলেনি আমার। কিন্তু আমার প্রীতম আমাকে সে-ই কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি।

আমার পড়াশোনার ইতি বোধহয় এখানেই। অনার্স বাতিল করেছি। দেখি পাস কোর্সে পড়তে পারি কি না। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয় এটা এখন বুঝতে পারলাম।

ভালোবাসা সার্থক করতে কতো যে কষ্ট করতে হয় তা আমরা এখন বুঝি। আমাদের এক বছর আগের আনাড়ি প্রীতম এখন রতিক্রিয়ার বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে।

এমন না দেখা প্রেম আমার মতো কেউ করেছে কি না জানি না। তার কাকার কাছ থেকে ছোটবেলা থেকে তার নাম শুনতে শুনতে পাগল হয়েছিলাম। প্রীতম জানতো না । সে আমাকে বিয়ের জন্য দেখতে এসে পছন্দ করেছিল। তারপর আমার প্রেমের চিঠিতে একেবারে গলে গিয়েছিল। দুই বছর দুপক্ষের প্রচুর লড়াই হয়েছিল। অবশেষে প্রেমের জয় হলো।

খালি গায়ে বিবস্ত্র অবস্থায় প্রতিদিন আমরা দুইশ করে দুজন দুজনকে কিস দিই। সেই অবস্থায় তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ।

এখন ঈশ্বরকে বলি, সুখে রেখেছো প্রভু। এ সুখ যেন সারা জীবন থাকে।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*
*কাজলশাহ, সিলেট থেকে*

## অনুভূতি

– ফারিনাজ আশরাফ

ভালোবাসা দিবস। এ দিনটিতে সকলেই যেন এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে উন্মুখ হয়ে থাকে তার প্রিয়জনের কাছ থেকে অন্যদিনের চেয়ে একটু বাড়তি ভালোবাসা প্রাপ্তির আশায়। অথচ যে মানুষটি আমাকে অসীম মমত্বের বেড়াজালে আকড়ে ধরে রাখার কথা ছিল তিনি আজ পরম শান্তিতে চিরতরে শায়িত। তিনি আমার বাবা।

আব্বা যখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য চেন্নাই–র উদ্দেশ্যে রওনা দেন তখন স্বাভাবিকভাবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু ঘুণাক্ষরেও এ ভাবনাটি উদয় হয়নি যে, এ আব্বাকে তো আর দেখতে পাবো না। বার বার মনে হচ্ছিল, ইনশাআল্লাহ আবার তো এ এয়ারপোর্টেই আসতে হবে আমাদের, সুস্থ হয়ে ফিরে আসা আব্বাকে স্বাগত জানাতে।

সেই ২০০৩ সালের ২৪ জুলাই বিকেলের পড়ন্ত রোদে আব্বাকে শেষ দেখলাম। ১১ আগস্ট বিকাল চারটায় চেন্নাই–এর *অ্যাপোলো* হাসপাতালে মারা গেলেন আব্বা। আমি ঢাকায় বসে খবর পেলাম সবার শেষে সন্ধ্যা সাতটায়। মৃত্যুর খবর পাওয়ার সেই মুহূর্তটির কথা বর্ণনা করার মতো লেখনি শক্তি আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, আমার পায়ের নিচ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের মাটি সরে গিয়ে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল কঠিন অবিশ্বাসের জমিন।

আমি যেন কিছুতেই আব্বার মুখটাকে মনে করতে পারছিলাম না। কেবলি মনে হচ্ছিল, এখুনি সবাইকে চমকে দিয়ে আব্বা ঘরে এসে ঢুকবেন। আমরা দুই বোন চোখ মুছে দৌড়ে গিয়ে আব্বাকে জড়িয়ে ধরবো।

১৩ আগস্ট দুপুর বারোটা নাগাদ আব্বার কফিন নিয়ে আসা হলো বাসায়। এভাবে আব্বা কফিনে শায়িত। এই দৃশ্য দেখার চেয়ে আমি মহান আল্লাহতাআলার কাছে মৃত্যু কামনা করলাম। এ আমি কি দেখছি, কোথায় আমার সেই পৌরুষদীপ্ত, সুপুরুষ, চিরসবুজ বাবা? কি নিথর, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, কালচে নীল একটি মুখ। সমস্ত মুখে ছড়ানো একটা চাপা অব্যক্ত বেদনা।

আব্বার গালে আর কপালে হাত রাখলাম। রেফ্রিজারেটরে রাখার কারণে শরীর তখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা আর পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। এই মুহূর্তটি সহ্য করতে পারাটা আমার জন্য ছিল চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। বিকাল চারটার মধ্যে সেনাবাহিনীর কবরস্থানে আব্বার দাফন হয়ে গেল। সব কিছু কেমন যে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আব্বার সমস্ত কথা, উপদেশ, ছবি, তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র, এমনকি আব্বা স্বয়ং আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে গেলেন।

চিটাগাং চলে আসার আগের দিন আম্মাকে নিয়ে আব্বার কবরস্থানে গেলাম। বিশাল এক আমলকি গাছের নিচে সবুজ ছায়ায় কবরটি ঢাকা। দেখলেই শান্তি লাগে। সেদিন বেশ বৃষ্টিও ছিল। দেখলাম কবরের চতুর্থ পাশে বেশ পানি জমে গেছে। আমার মনে পড়ে গেল, আব্বাকে ডায়ালাইসিস করার দরুণ হিসাব করে পানি খেতে হতো।

তিনি পানি পরিমাণ মতো খেতেন ঠিকই কিন্তু চোখের সামনে জগ ভর্তি শাদা পানি দেখে ছটফট করে বলতেন, কবে যে এক গ্লাস ভর্তি পানি তৃপ্তি করে খাবো!

আমার সেই তৃষ্ণার্ত বাবার কবরের চার পাশে আজ পানি থৈ থৈ করছে। আব্বার সেই তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি খাওয়া দেখতে পারিনি। সেই সৌভাগ্য আমার হয়নি।

কবর জিয়ারত করে চলে আসার সময় হঠাৎ আমার মনে হলো, পেছন থেকে আব্বা ডেকে বলছেন, তোমরা এখনি চলে যেও না আর কিছুক্ষণ আমার কাছে থেকে যাও। আমি যে এখানে বড় নিঃসঙ্গ।

মনে মনে বললাম, আব্বুজি, আমাদের তিন ভাইবোনের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত আমরা তোমাকে আগলে রাখবো। তুমি পরম শান্তিতে ঘুমাও। আমরা তিনজন তোমার সকল পবিত্রতার পাহারাদার হয়ে শিয়রে জেগে থাকলাম।

*চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম থেকে*

# জুস ও একটি স্মৃতি

– মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান

ঘটনাটি গত বছর এপৃল মাসের শেষ দিকের। সবে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি নিয়মিত রক্তদাতা। এ পর্যন্ত ১৩বার রক্ত দিয়েছি। চার মাস পর পর রক্ত দেয়ার নিয়ম। আমার সবে চার মাস দুই দিন গেছে। তাই হলের *বাঁধন* কর্মী আসাদ রক্তদাতাদের লিস্ট দেখে লোকটিকে আমার কাছেই পাঠালো। যেহেতু সবে চার মাস অতিক্রান্ত হয়েছে এবং পরীক্ষার ঠিক পর পর, তাই তখনকার মতো আমি রক্ত দিতে অনিচ্ছুক ছিলাম।

লোকটি আমার কথা শুনে বললো, আমার একমাত্র দুই বছরের মেয়েটি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। *বি পজিটিভ* রক্তের জন্য চার পাচজনের কাছে গেলাম। সবাই পরীক্ষার জন্য রক্ত দিতে চাচ্ছে না। আমার প্রতিদিন দুই তিন ব্যাগ রক্ত দরকার।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় রক্ত দিতে হবে?

ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে সন্ধানী–তে। লোকটি বললো।

প্যান্ট পরে লোকটির সঙ্গে চললাম। রিকশায় বসে পরিচয়ে জানলাম, সে একজন ভ্যানচালক, খুব ধার্মিক এবং গাজীপুরে থাকে।

লোকটি আক্ষেপ করে বললো, কেন এতো কঠিন রোগ দিয়ে আল্লাহ আমার মতো গরিব লোকটিকে পরীক্ষা করছেন বুঝতে পারছি না? সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আল্লাহ দিয়েছে, আল্লাহই মুক্তির মালিক। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন।

রিকশা থেকে নেমে রিকশা ভাড়াটা আমিই দিলাম।

রক্ত দিতে গেলে সবাই কোনো না কোনো ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করে। তাই সন্ধানীতে ঢোকার পথে লোকটিকে বললাম, রক্ত দেয়ার সময় বাইরে যাবেন না। আমার পাশেই থাকবেন। রক্ত দিয়ে আপনার মেয়েটিকে দেখবো।

কিন্তু আমি যখন রক্ত দিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে চোখের পলকে লোকটি আমাকে ফাকি দিয়ে বাইরে চলে গেল। রক্ত দিয়ে যখন বিছানা থেকে উঠছি তখন দেখলাম সে এক প্যাকেট প্রাণের জুস নিয়ে হাজির।

জুস দেখে বললাম, আপনি গরিব মানুষ এবং এ জন্যই আপনাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলাম। কেন অপচয় করতে গেলেন?

বললো, আর্থিকভাবে গরিব হতে পারি। কিন্তু মনের দিক থেকে তো গরিব না। তাছাড়া আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে রক্ত দিতে এসেছেন, একটা সৌজন্যতার তো ব্যাপার আছে।

তারপরও লোকটিকে বললাম, পারলে জুসটি ফেরত দিয়ে আসেন।

কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। কিছুতেই ফেরত দেবে না।

তাই জুসটি প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বললাম, চলেন আপনার মেয়েটিকে দেখে আসি।

গিয়ে দেখলাম, ফুটফুটে একটি নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়ে। তার মরণব্যাধি সম্পর্কে সে হয়তো কিছুই জানে না। তারপরও তার মায়ের সঙ্গে আনন্দ করছে। বাবাকে দেখেই লাফ দিয়ে তার কোলে উঠলো। পকেট থেকে জুসটি বের করে তার হাতে দিলাম। মনে হলো সে আকাশের চাদ হাতে পেলো। আনন্দে সে আত্মহারা। তবে সে জানে না তার আনন্দ কতো দিন স্থায়ী হবে!

জানি না সে বেচে আছে কি না! যদি বেচে থাকে তবে তার জন্য রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা।

*ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে*

zrsq@hotmail.com

## পঞ্চরত্ন

– নীলা

স্থান : পঞ্চরত্নের সভাকক্ষ। বিশেষ কারণে জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়েছে। পঞ্চরত্নের পাচ সদস্যই যথাসময়ে উপস্থিত। কিন্তু অন্যবারের মতো তাদের মাথায় ইবলিসীয় বুদ্ধি, চেহারায় দুষ্টুমি, হাসি এবার অনুপস্থিত। কারণ, এবারকার সমস্যাটা তাদের জন্য একেবারেই ভিন্ন।

এতোদিন অন্যের গাছগাছালি থেকে ফল চুরি করা, মুরগি চুরি করা, পিকনিক করা, পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডে নকল প্যারেন্ট সাইন দেয়া, পঞ্চরত্নের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো প্রতিবেশীর কাচ ভাঙা, তাকে সালাম দেয়া বন্ধ করার বিল পাস করাসহ এসব সমস্যায় সব সময়েই যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার ত্বরিত বাস্তবায়নে তারা সিদ্ধহস্ত হলেও এ সমস্যাটা পঞ্চরত্নের জন্য শুধু নতুনই নয়, কিঞ্চিৎ জটিলও বটে।

এবারকার সমস্যাটা *ভালোবাসা* সংক্রান্ত। তাই প্রতিবার অধিবেশন চলাকালে প্রত্যেকের চেহারায় যে কৃত্রিম ভাবগাম্ভীর্য থাকে তা এবার অনুপস্থিত। বরং তাদের চেহারায় খেলা করছে মিটিমিটি হাসি, চোখে লাজুক চাহনি। তা সবাই যথাসাধ্য ঢেকে সিরিয়াস হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও ব্যর্থতার ছাপ প্রত্যেকের মুখেই স্পষ্ট।

যাহোক, মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। তাদের কলোনিতে একটা নতুন ভাড়াটে ছেলে এসেছে প্রায় মাস তিনেক হতে চললো। চাদবদন এই ছেলেটির কথা তারা শোনেনি এমন নয়। তবে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। ধীরে ধীরে নাহিনের রূপের খ্যাতি তরুণী, অবিবাহিত মহলের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিবাহিত তথা প্রবীণ মহিলাঙ্গনে প্রবেশ করে। যখন পঞ্চরত্ন তাদের মায়েদের কাছে নাহিনের গল্প শোনে তখন তারা একটু নড়েচড়ে বসে। ততোদিনে নাহিনের হৃদয় হরণ করার একটা নীরব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে তরুণীদের মাঝে।

এর মধ্যে খবর আসে, থুক্কু আসে না, বরং পঞ্চরত্নের বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী *কিল বিল* (Kill Bill) গ্রুপ বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানায় যে, টিনা–নাহিনের মধ্যে ভালোবাসাবাসি চলছে।

এবার সত্যিই টনক নড়ে পঞ্চরত্নের। নাহ! কলোনিবাসীর সঙ্গে গৃহযুদ্ধ তো অনেক হলো। চিবুড়ি, কুতকুত ও আর কতোদিন খেলা যায়, এবার তারা বোধহয় বড় হয়েছে। ভালোবাসাবাসি করার বয়স হয়েছে তাদেরও।

কিন্তু কি করা যায়? পঞ্চরত্নের কেউই পড়াশোনা শেষ করে চাঢেক (চাকরিতে ঢুকি ঢুকি করা) নাহিনের সঙ্গে বয়সের দিক দিয়ে ঠিক মানানসই হচ্ছে না। মনি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ার, রীমা নীলা ক্লাস এইট, তুন্না

ক্লাস সিক্স আর রানু তো প্রাইমারির গণ্ডিই ছাড়ায়নি। তাই বলে কি তারা এমন সরস রসগোল্লাটা অন্যের পাতের খাদ্য হওয়াটা চেয়ে চেয়ে দেখবে?

না, এ হতে দেয়া যায় না। অবশেষে বাংলা সিনেমার দ্বারস্থ হয় তারা। সিনেমার চিরাচরিত ডায়ালগ আশ্রয় করে ঐকমত্যে পৌছে তারা, *প্রেম মানে না কোনো বয়স!*

যাহোক, যেমন করেই হোক নাহিনকে তাদের প্রেমে পড়াতে হবে। ইয়ে, আরো একটা বিষয়ে তারা ঐকমত্য পৌছে। ভালোবাসা মিশন যৌথভাবে পরিচালিত হলেও যেদিন থেকে নাহিন তাদের কাউকে ভালোবেসে ফেলবে সেদিন থেকে অন্যরা শর্তহীনভাবে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেবে। মাঠে নামতে যে তারা বেশ দেরিই করে ফেলেছে তা সবাই অনুভব করছে। তাই তারা পঞ্চমাসিক পরিকল্পনা স্থির করলো।

প্রথমত. টিনার (কলোনির ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়ে) সঙ্গে নাহিনের প্রেম প্রেম ভাব যেহেতু শুরু হয়ে গেছে, তাই আপাতত প্রথম কাজ হলো, কলোনিতে যেন তারা কোনোভাবেই দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত. নাহিনের গৃহে অবস্থান, বাইরে গমনাগমন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা। এ বিষয়টা কিল বিল গ্রুপের (পঞ্চরত্নের উত্তরাধিকারী কলোনির জুনিয়র জেনারেশন গ্রুপ) ওপর ছেড়ে দিলেই চলবে। তৃতীয়ত. এখন থেকে পঞ্চরত্নের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করা, ফ্রক পরা এসব বন্ধ করতে হবে। কলোনির বড়দের মতো বিকেলে মাঠে-রাস্তায় হাটা, গল্প করা, এসব করতে হবে সালোয়ার কামিজ, ওড়না পরতে হবে।

এ বিষয়ে অবশ্য মনি একটু এগিয়ে আছে। কারণ গ্রুপে সেই সবচেয়ে বড়। শেষ পর্যন্ত নাহিনের মন জয়করণ। আপাতত এসব কর্মপন্থা অনুসরণ করেই এগোতে হবে। তারপর মনি সংসদের চারশ বিশতম অধিবেশন সমাপ্ত ঘোষণা করে।

পরদিন থেকে পুরোদমে শুরু হয় তাদের ভালোবাসা মিশন ১৯৯২। প্রথম ধাপটা তারা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। অর্থাৎ নাহিন যখন বিকেলে বা রাতে ব্যাডমিন্টন খেলতে নামে তখন পঞ্চরত্ন টিনাদের জানালাটার সামনে দাড়িয়ে এমনভাবে আড়াল করে রাখে যে, সেখান থেকে মাছির সঙ্গেও চোখাচোখি করা অসম্ভব।

এদিকে নাহিনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের খবর কিল বিল গ্রুপ অদ্ভুত দক্ষতায় যথাসময়ে সরবরাহ করে।

নাহ! পঞ্চরত্ন তাহলে তাদের ভালোই ট্রেনিং দিয়েছে। তাদের শ্রমটা তাহলে বৃথা যায়নি। নিজেদের সাফল্যে অভিভূত পঞ্চরত্ন। একই সঙ্গে কিল বিল গ্রুপ যেন অগ্রজ পঞ্চরত্নের মতো মানুষের নিদ্রাহরণ করার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে শৈশব জীবনে সাফল্য অর্জন করে। সে দোয়াও করে।

এদিকে বিস্ময় বিমূঢ় কলোনিবাসী। ছেলেমেয়েদের এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা, ঘরে অসুস্থ রোগী, কোনো দোহাই দিয়েও যাদের হাউকাউ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো না, শত নালিশ, বিচার-আচারেও যাদের চৌর্যবৃত্তি, হই চই, ভাংচুরসহ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে নিস্তার পাওয়া যেতো না তাদের এমন অদ্ভুত রূপান্তরের কোনো রহস্যই তারা উদঘাটন করতে পারলো না।

বিকেলে *পঞ্চভূত* (কলোনিবাসীর দেয়া নাম) সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে সুবোধ বালিকার মতো সুন্দর দল বেধে হাটে। পঞ্চরত্ন অবশ্য এ সময় তাদের প্রত্যেকের মুখের জ্বলন্ত প্রশ্ন বেশ উপভোগ করে। মনে মনে হাসে তারা। যদি কলোনিবাসী আসল বিষয় টের পেতো তাহলে তাদের নাম পাল্টে পঞ্চভূতের জায়গায় *আধুনিক দ্রৌপদী* রেখে দিতো!

সালোয়ার, কামিজ, ওড়না পরে মনি, রীমা, নীলা এগিয়ে গেলেও পিছিয়ে পড়ছে রানু, তুন্না। বেচারা দুটো ফ্রকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে পায়জামা, ওড়না জোগাড় করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। একজনের ফ্রক হলুদ তো পায়জামা কমলা। ওড়না বেগুনি তো অপরজনের লাল জামা, গোলাপি পায়জামা, সবুজ ওড়না। অভূতপূর্ব কম্বিনেশন নিয়েই তারা এগোচ্ছে!!

শাবাশ পঞ্চরত্ন। এ কলোনিবাসী অবাক তাকিয়ে রয়!

এদিকে অন্যান্য সব কর্মকাণ্ড সম্মিলিতভাবে পরিচালিত হলেও নাহিনের মন হরণ(!) পর্বটা ব্যক্তি উদ্যোগে যে যার মতো চালিয়ে যাচ্ছে। এই যেমন মনি হয়তো পড়াশোনা, নোট করা এসব কাজে নাহিনের কাছে যাচ্ছে তো রানু তার বিদেশি দামি র‍্যাকেটটা দিচ্ছে নাহিনকে খেলার জন্য। অন্যদিকে বাবার সদ্য কেনা নতুন শার্ট চুরির মাধ্যমে ইস্ত্রি করে সুন্দরভাবে র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে নাহিনকে গিফট দিল রীমা। তুন্না বাসায় পোলাও রান্না হলে খেতে বসে মুরগির রানটা প্লেট থেকে উঠিয়ে হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রেখে পরে মা ঘুমালে রানটা ঝোলে ভালো মতো ডুবিয়ে একবাটি পোলাও সহকারে তা নাহিনকে দিয়ে আসছে। আবার নীলা দেশের বাড়ি থেকে আনা এক বাটি পিঠা খেতে বসে হঠাৎ মনে পড়ায় আধখাওয়া পিঠাগুলো ছুরি দিয়ে চৌকা, ত্রিকোনাকার, ডায়মন্ড বিভিন্ন শেপে কেটে সাজিয়ে দিয়ে আসছে নাহিনকে।

প্রেমে না পড়ে নাহিন যাবে কোথায়?

নাহিনও আজ মনিকে ভালো ছাত্রী বলে উৎসাহ দিচ্ছে, তো কাল রীমার শার্টের রঙ পছন্দের প্রশংসা করছে। কখনো রানুকে ধন্যবাদ দেয় তার র‍্যাকেট দিয়ে খেলাটা ভালো হচ্ছে বলে। একদিন তুন্নার রান্নার প্রশংসা করে, তো আরেকদিন নীলার কাছে পিঠা খাওয়ার আবদার করে।

কাজের অগ্রগতি তথা সাফল্যে তারা সবাই সন্তুষ্ট। বিপুল উৎসাহে নিত্যনতুন পরিকল্পনা তৈরি আর বাস্তবায়নও চলছে পুরোদমে। এর মধ্যে একদিন নাহিন তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ে মাঠে উপস্থিত থাকতে বলায় পঞ্চরত্ন মিশনের সাফল্য সেলিব্রেট করলো মহাসমারোহে।

কিন্তু নাহিন তো আর পাচজনের প্রেমে পড়েনি। আবার কার প্রেমে পড়েছে, সেটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। র‍্যান্ডম টেকনিকের মতো এখানে সবার সম্ভাবনাই সমান। তাই মনি তাদের সবাইকে দলীয় সংবিধানের ধারার কথা স্মরণ করিয়ে দিল যাতে ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা না হয়।

নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক, দলীয় শৃঙ্খলার প্রতি সবাই আনুগত্যে অটল থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

অতঃপর সাজগোজ পর্ব সমাধা করে তারা দুরু দুরু বুকে হাজির হলো যথাসময়ে। সবারই চোখের পাতা নায়িকাদের মতো পিটপিট করছে।

এর মধ্যে নাহিনও উপস্থিত হয় এক সময়।

তারপর সে বলে, তোমরা সবাই খুব ভালো। আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি। তাই একটা সুখবর কলোনির মধ্যে সবার আগে তোমাদের জানাচ্ছি। কিছুদিন পরই তোমাদের টিনাআপুর সঙ্গে আমার বিয়ে। তোমাদের সবাইকে আমার স্পেশাল নিমন্ত্রণ। অবশ্যই আসবে।

এটুকু বলে লাজুক হেসে চলে যায় নাহিন। পঞ্চরত্নের চোখের কোনে আবারও ভাসে ঐকমত্য। তার মানে আবার ফিরে যাওয়া সেই কিচিরমিচির কোলাহল পূর্ণ দিনগুলো হাউকাউ, ধ্বংস, আবার...।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে পঞ্চরত্নকে তখন সত্যিই পঞ্চভূতের মতো লাগছিল।

*ঢাকা থেকে*

## নাদান

– মাথরাজ

তোমার রুমাল আর চিঠিগুলো হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু ইচ্ছা করেও স্মৃতি ভুলে যেতে পারিনি।

কতোদিন আগের কথা। তবু স্মৃতির ফুলগুলো আজও আমার মনে তরতাজা। শাদামাটা কাগজে কাচা হাতের লেখা ছোট্ট ছোট্ট চিঠি। শাদা কাপড়ের ওপর গোলাপি, লাল আর সবুজ সুতায় তোলা ফুলের ছবি এখনো আমার চোখে ভাসে।

এখনো কোনো ঘুমহীন রাতে তোমার চিঠিগুলো আর রুমালের কথা চিন্তা করতে করতে তোমার মুখটি স্মরণ করতে চেষ্টা করি। শ্যামলা একটা ঝাপসা মুখ আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে।

ছোট এক টুকরো কাপড়ের বুকে তোমার কোমল হাতের স্পর্শ নন্দিত তোলা গোলাপ ফুল শিশির ভেজা হয়ে আমাকে মোহিত করে। ছোট্ট ছোট্ট চিঠিতে তুমি কি লিখেছিলে তা ধীরে ধীরে অতীত ঘাটতে ঘাটতে স্মরণ করতে চেষ্টা করি। চিঠিগুলোর ভাষা আমার কাছে স্পষ্ট হয় না।

তবে একটি শব্দ খুবই মনে পড়ে। তুমি লিখেছিলেন, ভালোবাসি।

তখন বুঝিনি এই শব্দটি শুধু একটা শব্দ নয়, এটা জীবনীশক্তি। সেই জীবন এবং শক্তিকে আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েও অনাদর অবহেলায় কোথায় যেন রেখেছিলাম যা আর খুজে পাচ্ছি না।

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল কোনো এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, কি ছিল সেটা মনে নেই। জীবনের মানেটাই তোমার কাছে পরিষ্কার হয়নি তখন। তখন তোমার কতো বয়স হবে? বড়জোর চোদ্দ কি পনেরো। আর আমার বিশের উপর।

আমার যে বয়সটা তখন ছিল ওই বয়সের ছেলেরা ভালোবাসার গন্ধ পেলে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে। কিন্তু আমি ছিলাম মুখচোরা। তোমাকে দেখার আগে আমার কোনো নারীর সঙ্গে সামনাসামনি কথাও হয়নি। মাথা নিচু করে থাকাই ছিল আমার অভ্যাস।

যারাই আমাকে দেখতো তারাই বলতো –

*ছাইও না, মাটিও না*

*গাইও না, বলদও না*।

কি ছিলাম আমি? আমার সামনে তখন সব কিছু ছিল ঝাপসা। কি করবো, কি করা উচিত কোনোটাই স্থির করতে পারতাম না। তাই মাথা নিচু করে থাকাই শ্রেয় মনে করতাম।

তুমি আমাকে মাথা উচু করার জন্য ডাক দিয়েছিলে। জীবনে অর্থবিত্ত খ্যাতির চেয়ে ভালোবাসার বেশি প্রয়োজন। আমি নাদান, সে কথা বুঝিনি।

*পাইকপাড়া, ধামরাই, ঢাকা থেকে*

## মনোমিতা

– এম. সালাউদ্দিন আলাল

১৯৮৫ সালের ঘটনা। ছোট মামার বিশেষ অনুরোধে পাশের গ্রামে তার ছোট শ্যালক-শ্যালিকাকে পড়াতে যাই। মামার তিন শ্যালক ও তিন শ্যালিকা। বড় শ্যালিকা মিতা ক্লাস এইটে পড়ে। আমি তাকে পড়াতাম না। মাঝে মধ্যে অংক আর ইংরেজি আমার কাছ থেকে দেখে নিতো। এ মিতাই আমার সর্বনাশ করলো।

প্রথম যেদিন তাকে দেখেছিলাম সেদিন সমাজ, ধর্ম সম্পর্ক সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। তার অপূর্ব সুন্দর মোহময়ী রূপ আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। ছোটদের পড়ানোর ফাকে হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখি পূর্ণিমার চাদের মতো ঘর আলোকিত করে হাতে নাশতা নিয়ে সে ঢুকলো। অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। তার মিষ্টি হাসি, লজ্জাবনত কাজল টানা চোখ আমাকে আবেশে বিভোর করে ফেললো। কি খেয়েছিলাম, কি দিয়েছিল কিছুই মনে নেই। কিন্তু সে সম্পূর্ণ প্রবেশ করেছিল আমার হৃদয়ে। আকাশে পূর্ণিমার চাদ নিয়ে তাদের বাসা থেকে বের হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ওই চাদটাই মিতা হয়ে গেছে।

সেই থেকে শুরু। হৃদয়ে প্রেম জ্বর বাড়তেই থাকলো। কাউকে বলতে পারছি না, ভুলতে পারছি না। যতোই তাকে দেখছি ততোই আরো মোহময়ী লাগছে। নামাজ-কালাম পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তাকে

ভুলে যাবার জন্য। নামাজের আহকাম-আরকান, সুরা-দরুদ ভুল করে সব কিছু ছ্যাড়াব্যাড়া করে ফেলি। শুধু তার মুখ চোখে ভাসে। হাদিস-কুরআন ঘাটাঘাটি করে দেখি শরিয়ত মোতাবেক কাকে কাকে বিয়ে করা যায়। মামার শ্যালিকাকে বিয়ে করা যায়। হুজুরের কাছে এই ফতোয়া শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠি। কিন্তু যে আমার হৃদয় মাঝে বাস করছে সে তো কিছুই জানে না। তাকে নিয়ে গান গাই। হেমন্ত, মান্না, বশির আহমদ, আবদুল জব্বার ও খুরশিদ আলমের মিলন বিরহের গান শুনে রাতের পর রাত জেগে থাকি। গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, সঞ্চয়িতা, শেষের কবিতা, জীবনানন্দের রোমান্টিক ও আবেগঘন কাব্যগাথা পড়ে নিজেও কবি হয়ে যাই।

হঠাৎ একদিন *তুমি আছো হৃদয় মাঝে* শিরোনাম দিয়ে আমার জীবনের প্রথম একটি কবিতা লিখে ফেলি। যার মাঝে তার রূপের বর্ণনা, আদর-আপ্যায়ন, তার বিরহজ্বালা ইত্যাদি সুচারু রূপে বর্ণনা করে, দোয়া-কালাম পড়ে তাকে পড়তে দিই।

কবিতা দেয়ার পর চার দিন সে আমার সামনে আসেনি। তারপর পঞ্চম দিনে লজ্জা মিশ্রিত কপট রাগ দেখিয়ে আমার সামনে এসে বললো, ছিঃ, ছিঃ! এসব কি লিখেছেন আপনি? আপনার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন? শিক্ষিত মানুষ হয়ে আমাকে নিয়ে এ রকম ভাবতে আপনার লজ্জা হলো না? একটুও বিবেকে বাধলো না? কি আছে আমার মাঝে, আমি কি এতোই সুন্দর?

কবিতা দেয়ার পর গত কয়েকদিন সে আমার সামনে কেন আসেনি সেই ভাবনায়, লজ্জা, দুঃখে ও অস্থিরতায় মনটা পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। শীতের সেই সন্ধ্যালগ্নে তার সামনে দাড়িয়ে স্পষ্ট করে বললাম, সমাজ, সামাজিকতা, সম্পর্ক কোনো কিছুই মানি না। ধর্মীয়ভাবে আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারবো। তাছাড়া আপনাকে দেখে, আপনার আচার-আচরণ, ওই চাদের মতো পবিত্র মুখ দেখে এতো ভালো লেগেছে যে, আপনাকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো নারীর প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। তারপর দুই হাত দিয়ে তার মুখটি স্পর্শ করে বললাম, আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, তোমাকে না পেলে মরে যাবো।

হঠাৎ সে ডুকরে কেদে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

ঘন কালো চুলে ঢাকা মাথাটাকে বুকে চেপে ধরে আনন্দ অশ্রু ফেলে বার বার বলতে লাগলাম, প্রিয়া, আমার প্রিয়া!

তার কুমারী শরীর কেপে উঠে আমাকে আরো আবেশে জড়িয়ে ধরলো। জীবনের প্রথম নারীর ছোয়া ও বুকের মাঝে গন্ধরাজের সুরভি আমাকে মাতাল করে দিল।

তারপর দীর্ঘ প্রায় পাচ বছর চললো আমাদের লুকোচুরি খেলা। মিতা ছিল খুবই বাস্তববাদী। বেশি কাছে আসতো না, দূরে কোথাও যেতে চাইতো না। বিশেষ বিশেষ আনন্দ উৎসবে তাকে কাছে পেতাম। মাঝে মধ্যে পাল তোলা নৌকা ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র নদীতে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বেড়াতাম। কখনো কখনো শীতের দুপুরটা কাটাতাম ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিকাল গার্ডেনে। দিনগুলো *মোর সোনার খাচায়* এখনো বন্দী।

১৯৮৯-এ সরকারি চাকরিতে যোগদান করি। গত পাচ বছর প্রতিদিন তাকে না দেখলে আমার ঘুম হতো না। দুদিন তার সঙ্গে দেখা না হলেই অস্থির হয়ে যেতাম। ঢাকায় এসে কয়েকদিন না থাকতেই পাগলের মতো হয়ে গেলাম। একে তো তার সঙ্গে আমার সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক। তাছাড়া দুই পরিবারের সকলেই হালকা হালকা জেনে গেছে। এখন যদি তাকে চাপ প্রয়োগ করে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেয় তাহলে আমি শেষ।

রাত জেগে দুটো চিঠি লিখলাম। একটি মাকে, আরেকটি মিতাকে। পরদিন ভোরে আমার প্রতিবেশী পোস্ট অফিসের পিয়নকে কিছু টাকা বকশিশ দিয়ে চিঠি দুটো পোস্ট করলাম। এর এক সপ্তাহ পর আর সহ্য করতে

না পেরে উইকএন্ডে বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি গিয়ে শুনি আরেকটু দেরি হলে আমাকে আনতে লোক পাঠাতো।

শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়িতে কেমন একটা উৎসব উৎসব ভাব। মা আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। ছোট ভাইবোনেরা কেমন উদাসীন ভাব। দাদিমা মিটি মিটি হাসেন। বিকেলে বাবা পাচ হাজার টাকা ও একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বললেন ছোট ভাইকে নিয়ে বাজারে যেতে।

লিস্টে লাল কাতান শাড়ি, হলুদ শাড়ি, পাগড়ি ইত্যাদি নাম দেখে দৌড়ে দাদির ঘরে ঢুকে বললাম, *দাদিমা, বাবা আমারে টেহা দিয়া এসব কিনবার পাডায় ক্যান?*

দাদি হেসে বলেন, *আইজ তরে বিয়া করাইবো।*

আমি অস্থির হয়ে বলি, *কেডা! কেডা! কার লগে আমার বিয়া!*

দাদি বলেন, খেপিস না, তর পিয়ার লগেই।

খুশি আর লজ্জায় তাড়াতাড়ি জামা পরে ছোট ভাইকে নিয়ে বাজারের দিকে ছুটলাম।

বাসর ঘরে সুযোগ পেয়েই বৌকে বললাম, ঘটনাটা কি, বাড়িতে না আসতেই তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল?

বৌ দীর্ঘ সময়ের গাম্ভীর্য এক পলকে মুছে ফেলে হাসতে হাসতে বাসর শয্যায় লুটিয়ে পড়ে বললো, তুমি একটা গাধা! আমার চিঠি মায়ের কাছে আর মায়ের চিঠি আমার কাছে পাঠিয়েছো।

এ কথা শুনে একেবারে ফৃজ। মিতার চিঠি মা পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। চিঠিতে নাকি খোদার কসম দিয়ে লিখেছিলাম, যদি চাপ প্রয়োগ করে তাকে অন্য কোথাও বিয়ে দেয় তাহলে শোনা মাত্রই আত্মহত্যা করবো।

সেই মিতা এখন আমার বধূ। এখনো আমরা দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসি। দুটি সন্তান নিয়ে আমাদের সংসারে অফুরন্ত সুখ।

*আকুয়া, ময়মনসিংহ থেকে*

## অস্বাভাবিক

Fud-1

মেয়েদের প্রতি আমার আগ্রহ নেই দেখে বন্ধুরা আমাকে নানান কথা বলে। এমনকি আমার সেক্স নিয়েও প্রশ্ন করে। তবুও আমার আশপাশের মেয়েদের প্রতি কোনো আগ্রহ জন্মাতে পারছি না। আমার মন বাধা পড়েছে অন্য জায়গায়।

আজকে ক্লাস হবে না? মাত্র এই একটা প্রশ্ন ছাড়া তার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি। হাজার সুযোগ থাকলেও আমি কোনো চেষ্টা করিনি। কোচিংয়ের পাচটি মাস শুধু তাকে দেখেই এসেছি। ধরা পরে যাবো সে জন্য কখনো তার সামনে যেতাম না। কখনো পেছন থেকে বা কখনো পাশ থেকে দেখেছি।

কিন্তু এখন সামনে থেকে দেখতে ইচ্ছা করে। তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। তাকে ছুয়ে দেখার তীব্র ইচ্ছা জাগে। এমন কোনো সময় নেই যে, এখন তার কথা মনে পড়ে না। ভবিষ্যতের এমন কোনো চিত্র নেই যা তাকে নিয়ে কল্পনা করছি না।

মহুয়া, তোমার কথাই বলছি। তুমি হয়তো কখনো জানবেও না তোমার প্রতি আমার অস্বাভাবিক দুর্বলতা। কখনো কি তোমার সঙ্গে হবে দেখা? ভালো থেকো।

*ফার্মগেট, ঢাকা থেকে*